গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২৫ ফেব্রুয়ারি - ৩ মার্চ, ২০১১ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে বারাসতে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত বনধ

বারাসতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোর রাজীব দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই ক্ষোভ ভাষা পায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় শতাধিক কর্মী-সমর্থক দলের জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে ডিএম বাংলোর গেটে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। এস পি বাংলোর গেটেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত্রে যে পুলিশ প্রশাসন দিদি রিঙ্কু দাসের আর্তিতে সাড়া না দিয়ে নির্বিকার ছিল, তারাই বিপুল বাহিনী নিয়ে এসে লাঠি উঁচিয়ে বিক্ষোভ থামাতে উদ্যত হয়। প্রচুর সংখ্যায় সাধারণ মানুষ বিক্ষোভস্থল ঘিরে জড়ো হয়ে যান। বিক্ষোভ দেখানো হয় জেলাশাসক ভবনেও। জেলাশাসক ভবনে সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর লাঠি চালায়। লাঠির আঘাতে মহিলা সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। ইতিমধ্যে বারাসত জেলা হাসপাতালের উত্তর প্রান্তে বাণীকণ্ঠ নগরের প্রবেশ পথে স্থানীয় বাসিন্দারা যশোর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে এস ইউ সি আই (সি)-র মিছিল সেখানে পৌঁছায়। আধঘণ্টার উপর চলা সেই অবরোধে আটকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসেও তাঁর কনভয়কে মুক্ত করতে পারেনি। পরে মুখ্যমন্ত্রী রাজীবদের বাড়ি পৌঁছালে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা সেখানেও তীব্র ধিক্কার জানান। সাধারণ মানুষ চিৎকার করে বলতে থাকেন ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’ ‘কী করতে এসেছেন?’

ঐ দিনই কলকাতায় মহাকরণের সামনে প্রধান ফটকে প্রায় দুশো

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজীবের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘিরে কিছু প্রশ্ন

বারাসাতের ডি এম বাংলোর ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে দিদি রিঙ্কু দাসের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে রাজীব দাসকে যেভাবে প্রাণ দিতে হল, তা জেনে বিবেকবান মানুষ মাত্রেই শিউরে উঠেছেন। ১৬ বছরের এক কিশোর রাজীব ছিল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কল সেন্টারে চাকরি করে ফেরা দিদিকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসার জন্য স্টেশনে প্রতিদিন রাতে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করত রাজীব। এ দিনও দিদিকে সাইকেলে নিয়ে ফিরছিল সে। রাত এগারোটা নাগাদ তারা ডি এম বাংলোর সামনে পৌঁছলে এক দল মদ্যপ ঘিরে ধরে তাদের। দিদির শ্লীলতাহানি করতে গেলে বাধা দেয় রাজীব। দুষ্কৃতীরা রাজীবকে আক্রমণ করে। রিঙ্কু সাহায্যের জন্য ডি এম বাংলোর দিকে ছুটতে থাকে। পথচলতি দু’একজন যারা ছিল তাদের আবেদন জানায়। কিন্তু দুষ্কৃতীদের হুমকির সামনে দাঁড়াতে পারেনি তারা। রিঙ্কু ছুটে যায় সামনের এস পি বাংলোয়, পাহারাদার কনস্টেবলদের সাহায্য চায়। সব কিছু শুনেও সাহায্য করতে রাজি হয়নি ‘কঠোর কর্তব্যরত’ সেই উর্দিধারীরা। ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। রিঙ্কু দেখে, সাহসী এক ভ্যানচালক গুরুতর আহত রাজীবকে ভ্যানে তুলে নিয়ে আসছে। তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যায় তারা। জেলা হাসপাতাল জানায়, আহত রাজীবের চিকিৎসা করার মতো পরিকাঠামো তাদের নেই। তারা রেফার করে দেয় আর জি কর হাসপাতালে। শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি রাজীবকে।

১৬ ফেব্রুয়ারি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে দলের ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভ

রাজীবের মৃত্যু, রিঙ্কুর ব্যর্থ কাতর আবেদন গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার চিত্রটিকে একেবারে নগ্ন করে দিল। একটি জেলা সদরে, ডি এম বাংলো, এস পি বাংলোর সামনে যখন একজন নারীকে ঘিরে ধরে মত্ত নরপশুরা, নৃশংসভাবে খুন করে এক কিশোরকে, দুষ্কৃতীদের আস্ফালনে এগিয়ে আসতে পারে না কেউ, এমনকী সরকারি উর্দিধারীরাও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, তখন ঘটনাটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুলিশ প্রশাসন কীভাবে শাসক দলের কুক্ষিগত হয়েছে সি আই ডি রিপোর্টে তা আবার প্রমাণিত

নেতাই গণহত্যা নিয়ে আদালতে সিআইডি হলফনামা জমা দিয়েছে। তাতে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তদন্তের নামে আসলে সিপিএমের দুষ্কৃতীদেরই আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে। সিপিএমের লালগড় লোকাল কমিটির সদস্য ধৃত অবনী সিংহকে জেরা করে সিআইডি জেনেছে, নেতাই গ্রামে সশস্ত্র ক্রিমিনাল ক্যাম্প তৈরির পেছনে লালগড় লোকাল কমিটির ভূমিকা ছিল শুধু নয়, দলের বিনপুর জোনাল কমিটির এক সদস্য ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। এই ক্যাম্পটি হয়েছিল সিপিএম নেতা রথীন দণ্ডপাটের বাড়ির দোতলায়। জেরায় অবনীবাবু স্বীকার করেছেন, তিনি থাকতেন ঐ বাড়ির একতলায়। অবনী সিংহ আরও বলেছেন, বীরকাঁড় গ্রামে ইন্দ্রজিৎ দাসের বাড়িতেও আর একটি ক্রিমিনাল ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন লোকাল কমিটির সম্পাদক জয়দেব গিরি। সিআইডির জেরায় অবনীবাবু বলেছেন, অস্ত্র প্রশিক্ষণের প্রতিবাদ জানাতে গ্রামবাসীরা জড়ো হলে প্রথমে বীরকাঁড় গ্রামের সশস্ত্র শিবিরে খবর পাঠানো হয়। সেখান থেকে জনা দশেক ক্রিমিনাল সঙ্গে সঙ্গে নেতাইয়ে চলে আসে এবং গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। এরপর গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়ালে দন্ডপাটের বাড়ির দোতলা থেকে গুলিবৃষ্টি শুরু হয়। চার মহিলা সহ মারা যান মোট ৯ জন, আহত অনেকেই। অবনীবাবু আরও বলেছেন, গত ২৩-২৪ ডিসেম্বর এই ক্রিমিনাল দলটিকে নেতাই-এ নিয়ে আসেন লালগড় লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক তপন দে।

কিন্তু, অবনীবাবুর জবানবন্দী থেকে পাওয়া এসব তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত যেভাবে এগোনো দরকার ছিল, সিআইডি তা করেনি। সত্য উদ্ঘাটনের জন্য জরুরি ছিল, যে দুটি বাড়িতে সশস্ত্র ক্যাম্প হয়েছিল, তার মালিকদের গ্রেপ্তার করা, বিনপুরে জোনাল কমিটির অভিযুক্ত সদস্য সহ ক্রিমিনালদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা তপন দে ও জয়দেব গিরিকে গ্রেপ্তার করা। কিন্তু সিআইডি তা করেনি। কেন করেনি? সি আই ডি-তে কি যোগ্য অফিসারের অভাব ছিল? আসলে এ রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসনের মতোই সি আই ডি-ও শাসক সিপিএমের অঙ্গুলি-নির্দেশেই চালিত হয়। তদন্ত যথাযথভাবে পরিচালিত হলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ত। দেখা যেত, এ ঘটনার সঙ্গে শুধু সিপিএমের স্থানীয় নেতারাই নয়, যুক্ত আছেন দলের বহু রাঘব-বোয়ালই। তাঁদের নেতৃত্বে কীভাবে সারা রাজ্য থেকে এমনকী পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকেও দাগী খুনি ও ক্রিমিনালদের তাঁরা ভাড়া করে এনে জড়ো করেছেন, তা প্রকাশ হয়ে পড়ত। শুধু তাই নয়, যৌথবাহিনীকে সামনে রেখে জঙ্গলমহলে গত একুশ মাস ধরে যে অসংখ্য খুন হয়েছে, সেগুলির পিছনেও সিপিএমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা উঠে আসত। এমনকী, যৌথবাহিনীর ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিত। এই কারণেই সিপিএম নেতারা চাননি সিআইডি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করুক। তাঁদের লক্ষ্য, একদিকে জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনকে ‘মাওবাদী’ তকমা দিয়ে দমন করে পুঁজিপতিশ্রেণীর অবাধ লুঠতরাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, অপরদিকে মাওবাদী ধুয়ো তুলে যৌথবাহিনী ও দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনীর সাহায্যে জঙ্গলমহলকে বিরোধীশূন্য করে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সহায়তায় নিরঙ্কুশ জয় নিশ্চিত করা।

পক্ষপাতমুক্ত নিরপেক্ষ তদন্তের এই গুরুতর গাফিলতির জন্য হাইকোর্ট বাধ্য হয়ে সিবিআই-কে তদন্তের ভার দিয়েছে। সিবিআই সত্য উদ্ঘাটনে কতটুকু সমর্থ হবে, তা ভবিষ্যতই বলবে। সিআইডি যেমন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ একটি গোয়েন্দা সংস্থা, সিবিআইও তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের। সকলেই জানেন, লালগড় প্রায় দু’বছর ধরে কেন্দ্রের কংগ্রেস ও রাজ্যের সিপিএম সরকারের সম্মিলিত যৌথবাহিনীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে। এই যৌথবাহিনী মাওবাদী খোঁজার অজুহাতে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে।

সাতের পাতায় দেখুন

সিপিএম বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে

কলকাতায় সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু

২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তৃণমুল কংগ্রেস আহুত সমাবেশে আমন্ত্রিত হয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, পঁয়ত্রিশ বছরে রাজ্যের সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করার পর সিপিএম নেতারা আজ বলছেন, রাজ্যের উন্নয়নে বিরোধীরা বাধা দিচ্ছে। সংবাদপত্রে আপনারা দেখেছেন, মায়েরা এ রাজ্যেও সন্তান বিক্রি করছেন। সন্তানকে মা কোন জ্বালায়, কোন অভাবে বিক্রি করতে যায়? সংবাদপত্রে আপনারা দেখেছেন, কোচবিহারের দিনহাটায় বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে কিশোরী মেয়েদের নিয়ে গিয়ে পাচার করা হচ্ছে। গোপনে পার হতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত ১৬ বছরের কিশোরীর দেহ ঝুলছে কাঁটাতারের বেড়ায়। চা-বাগানে হাজার হাজার শ্রমিক অনাহারে মারা যাচ্ছে। আমলাশোলে এখনও মানুষ অনাহারে মরছে, ধুঁকছে। চলে যান বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার খরা কবলিত প্রত্যন্ত এলাকায়, দেখবেন উন্নয়নের চেহারা। বস্তি পুড়িয়ে প্রমোটাররা বহুতল বাড়ি বানাচ্ছে। সর্বত্র কন্ট্রাক্টর-প্রোমোটারদের রাজত্ব, যা দেখে একদা সিপিএমের নেতা শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরী নিজের দলের সরকারকেই বলেছিলেন ‘কন্ট্রাকটরদের সরকার’। সোমনাথ লাহিড়ীর মতো নেতারা একদিন জীবনাচরণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, আজকের বুদ্ধদেববাবুদের দিকে তাকালে তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে?

কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএমের আমলে উন্নয়ন হয়েছে টাটা-বিড়লার। উন্নয়নের এই পথ ধরে এসেছে ইন্দোনেশিয়ার সালিম।

সাতের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিরাট বিক্ষোভ

কয়লা ও মিটার কেনা নিয়ে দুর্নীতির তদন্ত, অতিরিক্ত সিকিউরিটি বিল বাতিল, বিদ্যুতের মাশুল কমানো, বিদ্যুৎ মাশুলে ভর্তুকি ইত্যাদি দাবিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ফিয়ার্স লেনে তিন হাজারেরও বেশি বিদ্যুৎগ্রাহকের এক অবস্থান-বিক্ষোভ থেকে সঞ্জিত বিশ্বাস, অনুকূল ভদ্র, কুণাল বিশ্বাস, দেবাশিস চক্রবর্তী, চন্দন চক্রবর্তী প্রমুখের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাইটার্সে বিদ্যুৎমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেয়।

মালদার গ্রামে দৈন্যের ছবি

জেলাশাসককে এম এস এস-এর ডেপুটেশন

মালদা জেলার বানদীঘি গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের মায়েরা অভাবের তাড়নায় কোলের শিশুদের বিক্রি করার জন্য হাটে সারিবদ্ধভাবে বসে আছেন, এই মর্মান্তিক সংবাদ দেখে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ২৮ জানুয়ারি গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন। দেখা যায়, তাঁদের রেশন কার্ড নেই, বিপিএল তালিকায় নামও নেই। কারও কারও নাম আগে থাকলেও বর্তমানে কেটে দেওয়া হয়েছে। সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০০ দিনের কাজ পাওয়া তো দূরের কথা বছরে তিন দিনও কাজ জোটে না। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, স্কুল নেই, রাস্তাঘাটের অবস্থাও অনুরূপ।

এলাকার নারী-পুরুষের সঙ্গে কথা বলার পর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস ভারতী রায়, প্রণতি কর, অঞ্জলি নন্দী সহ জেলা প্রতিনিধি শুভ্রা বর্মণ, মল্লিকা সরকার, নমিতা রাজবংশী জেলা শাসক দপ্তরে যান। তাঁরা বানদীঘি গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের জন্য অবিলম্বে রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ড, বার্ধক্যভাতা, বিধবা ভাতা, ১০০ দিনের কাজের দাবি সহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট তৈরি করার দাবিতে জেলাশাসকের উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। অসুস্থতার কারণে জেলাশাসক দপ্তরে না থাকায় সহকারী জেলাশাসক স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ও অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

বাঁকুড়ায় ফি-বৃদ্ধি রুখে দিল এ আই ডি এস ও

বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের গুনিয়াদা হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ ভর্তি ফি ১২০ টাকা ধার্য করে। ২ ফেব্রুয়ারি ডি এস ও-র পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডি এস ও কর্মীরা বলেন, জেলা বর্তমানে খরার কবলে অথচ সরকার খরা মোকাবিলায় কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে মানুষের উপর বোঝা চাপাচ্ছে। অভিভাবকরা দাবি তোলেন, বিনা পয়সায় ভর্তি নিতে হবে, ফর্মের দাম নেওয়া চলবে না। প্রধান শিক্ষক প্রথমে মেনে নিলেও সিপিএমের মদতে পরে টালবাহানা করতে থাকেন এবং পুলিশ ডাকেন। পুলিশ ডি এস ও-র কমরেড মোহিত মণ্ডল এবং কমরেড সন্দীপ মণ্ডল সহ আট জনকে গ্রেপ্তার করে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র-অভিভাবকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ফলে পুলিশ তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরের দিন আন্দোলনের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ দাবিগুলি মেনে নেয়।

এই অভূতপূর্ব জয়ের ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও আন্দোলনমুখী উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। ঐ দিন বিকালে ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের একটি সাইকেল মিছিল প্রবল জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে গ্রামগুলি পরিক্রমা করে।

সাংসদ প্রকল্পের স্বাস্থ্য মেলা

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে
সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল-এর এম. পি প্রকল্পে
স্বাস্থ্য মেলা
গোসাবা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

১৬ ফেব্রুয়ারি সাংসদ প্রকল্পের স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত হল গোসাবা ব্লক হাসপাতালে। উদ্বোধন করেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিডিও বিশ্বজিৎ পণ্ডা, ওসি কৃষ্ণেন্দু দত্ত, বিএমওএইচ ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ডাঃ কৌস্তভ মণ্ডল (আইএমএ) ও ডাঃ হান্নান হালদার (এমএসসি)।

শ্রমিক সংগঠকের জীবনাবসান

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত আগরপাড়া জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহসম্পাদক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর একনিষ্ঠ সমর্থক কমরেড মহম্মদ আলী ২৯ জানুয়ারি মাত্র ৫৬ বছর বয়সে গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৭০-এর দশকের শুরুতে কমরেড আলী বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা প্রয়াত কমরেড ভবতোষ দত্তের সান্নিধ্যে আসেন। সে সময় তাঁর জীবন ছিল বেপরোয়া ও ডানপিটে। জীবনের ওই সন্ধিক্ষণে জুট শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড সনৎ দত্তের স্নেহচ্ছায়ায় এসে তিনি উন্নত জীবনের সন্ধান পান, নিজেকে বদলে ফেলার কঠোর ও কঠিন সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন এবং ইউনিয়নের কাজে যোগ দেন। আগরপাড়া জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বহু লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অগ্রণী নেতা। দলমত নির্বিশেষে যে কোনও শ্রমিকের বিপদে-আপদে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বহু প্রলোভন ও হাতছানিকে উপেক্ষা করে কমরেড আলী আগরপাড়া জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (সি)-র সাথে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে সমগ্র কামারহাটি অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর শেষযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ সামিল হন। ১১ ফেব্রুয়ারি কামারহাটির ইউনিয়ন অফিসের পাশে তাঁর শোকসভা আয়োজিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সম্পাদক এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড অমল সেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিটু, আই এন টি ইউ সি, এ আই সি সি টি ইউ-র বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা জানান ও মরদেহে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন এ আই এম এস এস-এর মহকুমা সম্পাদিকা কমরেড রত্না দত্ত।

কমরেড মহম্মদ আলী লাল সেলাম

নিম্নমানের অ্যান্টিবায়োটিক ঃ আর জি করে বিক্ষোভ

৩০ জানুয়ারি আর জি কর হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগের রোগীদের নিম্নমানের অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়ার ফলে ১৫ জন রোগীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। প্রতিবাদে ৩ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির কলকাতা জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ডঃ ঝোটন দাস ও আশীষ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে আর জি কর শাখা কার্ডিওলজি বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের পরিজনদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ও সুপারকে ঘেরাও করে। এই প্রতিবাদে সামিল হন হাসপাতালের বেশ কিছু চিকিৎসক। প্রতিবাদের চাপে সুপার ঐ ব্যাচের সমস্ত ওষুধ সিল করার এবং কমিটির দাবি মতো ইসিজি মেশিন কেনার নির্দেশ দেন।

বর্ধমান শহরে জনস্বাস্থ্য কনভেনশন

নাগরিক কনভেনশন
হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি
বর্ধমান শাখা

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি ও বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নের দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান শহরে জেলা জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির আহ্বানে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহ-সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় শতাধিক মানুষ কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন।

সারের কালোবাজারি ঃ কৃষক আন্দোলনের জয় পূর্ব মেদিনীপুরে

সিপিএমের রাজত্বে কৃষকের উপর শোষণ নজিরবিহীন। ইউরিয়া সারের সরকার নির্ধারিত দাম প্রতি কেজি ৫.৫২ টাকা। ব্যবসায়ীরা বিক্রি করছে ৭ থেকে ৮ টাকা দরে। ডিএপি ১০.৩৫ টাকার পবিবর্তে বিক্রি হচ্ছে ১২ থেকে ১৪ টাকায়। পটাশ ৫.২৬ টাকার পরিবর্তে বিক্রি হচ্ছে ৬.৫০ টাকায়। বছরের পর বছর ধরে এই শোষণ চলছে শাসকদল ও প্রশাসনের নির্লজ্জ প্রশ্রয়ে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এ আই কে কে এম এস। বহু ক্ষেত্রে ব্যবসাদারদের ন্যায্য দামে সার বিক্রি করতে বাধ্য করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিকট লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে অভিযোগ জানানোর পর সম্প্রতি কৃষিদপ্তর নড়েচড়ে বসেছে। কৃষিদপ্তর-জেলা পরিষদ-রাজনৈতিক দল-কৃষক সংগঠন ও সার ব্যবসায়ীদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক কমিটি গঠন করে কৃষকরা যাতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার পায়, তার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে দপ্তর। ১০ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাকক্ষে সিদ্ধান্ত হয়, (১) জেলায় সার লোডিং-আনলোডিং-এর জন্য একটি রেক পয়েন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হবে, (২) কোনওভাবে ইউরিয়ার ক্ষেত্রে এম আর পি (ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস) ও অন্য সারের ক্ষেত্রে বস্তায় লেখা রিটেল প্রাইস (আর পি) থেকে অতিরিক্ত দাম আদায় করা চলবে না। জেলা ও ব্লক ভিত্তিক তদারকি কমিটির চেয়ারম্যান হবেন যথাক্রমে সভাধিপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। আহ্বায়ক হবেন, যথাক্রমে কৃষি দপ্তরের উপকৃষি অধিকর্তা ও সহ কৃষি অধিকর্তা। সার ব্যবসায়ী, কৃষক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলেরও প্রতিনিধিরা কমিটিতে থাকবেন, (৩) ক্যাশ মেমো দিয়ে কৃষকদের সার বিক্রি করতে হবে। সার দোকানে মূল্য তালিকা/স্টক বোর্ডের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানাতে হবে, (৪) কৃষকদের অপ্রয়োজনীয় সার বা রাসায়নিক ঔষধ ট্যাগিং করে নিতে বাধ্য করা চলবে না।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় শত শত কোটি টাকার আলু কেলেঙ্কারি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বছর আলু কেলেঙ্কারিতে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে। চাষিরা মাঠ থেকে আলু তুলে দাম না পেয়ে হা-হুতাশ করেন, আর অনন্যোপায় হয়ে পোকা মারার জন্য কেনা বিষ নিজের গলায় ঢেলে একে একে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। এটাই হল বিগত কয়েক বছরের চিত্র। কারণ, বর্তমানে যে বিপুল দাম দিয়ে সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের জল প্রভৃতি কিনে চাষিকে আলু চাষ করতে হয় তাতে উৎপাদন ব্যয় কমপক্ষে ৩.৫০ টাকা কিলো পড়ে, অথচ চাষি আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয় ৮০ পয়সা থেকে ১ টাকা কিলোতে। ঠিক এই সময়টা প্রতি বছরই সরকার থাকে নির্বিকার। ফাটকাবাজরা আওয়াজ তুলে দিল — আলুর প্রচুর ফলন হয়েছে। কৃতিত্বটা তাদেরই, এমন ভাব দেখিয়ে সরকার সেই সুরে গলা মেলাল। প্রতি বছরের মতো এ বছর কৃষি বিপণন মন্ত্রী মোর্তাজা হোসেন তাঁর দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একেবারে নিখুঁত অঙ্ক কষে বলে দিলেন, কত আলু ফলেছে এবং হিমঘরগুলোতে কতটা রাখার জায়গা আছে। এত বেশি উৎপাদন হলে রাখব কোথায়? অতএব মাঠে পড়ে পচবে। নতুবা? পথ খোলা আছে, ফাটকাবাজ হাঙরদের পেটে চলে যাওয়া। চোখের জলে ভেজা আলু নিয়ে বিক্রির জন্য লাইনে দাঁড়ানো। সরকারের তখন ‘কিছুই করার নেই’। কিন্তু হাঙরগুলির পেট ভরে যাওয়ার পর, দেনাগ্রস্ত চাষি কিছু আত্মহত্যা করে, আর কিছু পরের বারের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আলু ‘বিক্রি’ করে দেওয়ার পর, মহামান্য গরিবদরদি সরকার হঠাৎ আবিষ্কার করেন, হায় হায়, গরিব চাষিদের তো সর্বনাশ হচ্ছে! সরকার কিছু করবে না, তা হতে পারে? সরকার ঘোষিত ‘ন্যায্য দামে’ আলু কিনতে নেমে পড়লেন মোর্তাজা সাহেব। কিছু বৃহৎ চাষি আর মূলত ফাটকাবাজরা, যাদের সঙ্গে পূর্বেই পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছিল সরকারের, তাদের ১ টাকায় কেনা বাড়তি কিছু আলু, মূলত খারাপ অংশটাই, তারা সরকারি ভাণ্ডারে ‘বিক্রি’ করে কিলো প্রতি কম করে আড়াই টাকা লুটে নিল। এর পাশাপাশি অন্য রাজ্যে আলু পাঠানোর নাম করে কিছু ব্যবসায়ীকে সরাসরি ‘ভর্তুকি’ দিয়ে দেওয়া হল। সেই সময়ে সংবাদপত্রে তথ্য সহযোগে প্রকাশিত হয়েছিল, সরকারি বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের তত্ত্বাবধানে লুঠ হয়েছে। ঐ টাকার একটা বড় অংশে জঙ্গলমহলে দলীয় বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র কেনা হয়েছিল।

২০০৮ সালেও ফলন ভাল হয়েছিল। সেবার রাজ্য সরকার ‘চাষি বাঁচাতে’ বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ভর্তুকি দিয়ে আলু পাঠিয়েছিল ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে। আর বছরের মাঝে ‘আলু নেই’ ধুয়া তুলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ফাটকা কারবারিরা আলুর দাম কেজি প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা তুলে দিল। ২০০৯-এ হল ব্যাপক ধসা রোগ। পুরো খরচ করে চাষি পেল মাত্র ১০ শতাংশ ফলন। দীর্ঘ গণআন্দোলনের পরে সরকার ঋণ মকুব ঘোষণা করল। মজার ব্যাপার হল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, ঘটি বাটি বিক্রি করে চাষ করেছে যারা অথবা স্থানীয়ভাবে চড়া সুদে যারা ঋণ নিয়েছিল, তাদের একটি পয়সাও মকুব হল না। কোটি কোটি টাকা চলে গেল ব্যাঙ্ক এবং সমবায় থেকে ঋণ নেওয়া প্রভাবশালী বৃহৎ চাষিদের পকেটে।

এ বছর উৎপাদন হয়েছিল ‘প্রচুর’। চাষি পেল কিলোতে ৮০ পয়সা। অভাবি বিক্রি শেষ হলে সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে ৩.৫০ টাকা কেজি দরে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কিনতে নেমে পড়ল। যা অতি সামান্য মাত্র। ঠিক এই খেলাটি শেষ হওয়া মাত্র উৎপাদিত প্রচুর বাড়তি আলু পি সি সরকারের জাদুর মতো ভ্যানিশ হয়ে গেল এবং সারা বছর ১০ টাকা দর হল বাজারে। সরকার ঘোষিত ‘ন্যায্য দাম’ ৩.৫০ টাকা কোথায় গেল? এই ফাটকাবাজি বন্ধে এস ইউ সি আই (সি) দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে আসছে খাদ্যশস্য সহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের পাইকারি ও খুচরো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার জন্য। তাতে চাষি বাঁচে, ন্যায্য দাম পায়; ক্রেতা বাঁচে, সারা বছর ন্যায্য মূল্যে কিনতে পারে; আর বহু সংখ্যক বেকার যুবক সরকারি এই ব্যবস্থাপনার নানা স্তরে চাকরি পায়। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভার বিনয় চৌধুরী সহ্য করতে না পেরে নিজেদের সরকারকে ‘ঠিকাদারদের সরকার’ বলেছিলেন। এখন প্রমাণিত, তা পদে পদে ফাটকাবাজদের সেবাদাস। হায় গরিবদের সরকার! যেমন মহারাষ্ট্রের নাসিকের পেঁয়াজ চাষি দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করে, আর আমরা ক্রেতারা ৬০-৭০ টাকায় পেঁয়াজ কিনতে বাধ্য হই। যেমন অন্ধ্রের তুলোচাষি তুলোর দাম না পেয়ে হাজারে হাজারে আত্মহত্যার পথ নেয়, আর আমরা অগ্নিমূল্যে কাপড় কিনি অথবা কিনতে পারি না। তেমনি আলু, টমেটো, লংকা নিয়ে ফাটকা, রাজ্যের বাজার দাপিয়ে চাষিকেকাঁদায়, ক্রেতাকে কাঁদায়। আর বুদ্ধবাবুর ‘ডু-ইট-নাউ’ সরকার চুপটি করে বসে থাকে। চালিয়ে যাও — ভাগ দাও! তোমরা আমাদের দেখ, আমরা তোমাদের দেখছি।

চিত্রনাট্যের অপর অধ্যায় আরও চমকপ্রদ। শত শত কোটি টাকা দিয়ে কেনা আলু নিয়ে খেলাও জমজমাট। এই অধ্যায়ে অবতীর্ণ হিমঘর মালিকেরা। হঠাৎ দেখা গেল হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় একের পর এক হিমঘর মালিক অথবা ম্যানেজার কোথায় যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। সরকার, তার পুলিশ, গোয়েন্দা কেউ সন্ধান পাচ্ছে না। অতএব সরকারি আলু বাজারে আনা যাচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের রাখা আলু চড়া দামে বিক্রি নিশ্চিত হয়ে গেল। মাস খানেক পরের সংবাদ — একের পর এক হিমঘরের মালিক সরকারের রাখা হাজার হাজার কুইন্টাল আলু রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। গরুতে খাচ্ছে, পচে নষ্ট হচ্ছে। বর্ধমানের পণ্ডালি হিমঘর থেকে সরকারি বেনফেডের রাখা ৭০ হাজার বস্তা (৩৫ হাজার কুইন্টাল) আলু, আসানসোলে ১৩০০ বস্তা কনফেডের আলু রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাজার দরে যার মূল্য ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মোর্তাজা সাহেবের কিন্তু কোনও হেলদোল নেই। স্থানীয় সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কালোবাজারিদের মদতদাতা সরকারের ভূমিকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুর সরকার নির্বিকার। এই টাকায় কত ভুখা মানুষ খেতে পারত, তা আজ এদের ভাবায় না। সিঙ্গুরে উর্বর জমি কেড়ে নিয়ে টাটার মোটর গাড়ির কারখানা না করতে পারলে গোটা দেশের কাছে ‘মাথা হেঁট হয়ে যাবে’ বলেছিলেন (নজরুল মঞ্চে হরকিষেণ সিং সুরজিতের স্মরণ সভার ভাষণ) বুদ্ধবাবু, লক্ষ লক্ষ ভুখা মানুষের পেটে লাথি মেরে, হাজার হাজার চাষির সর্বনাশ করে আজ কিন্তু বুদ্ধবাবুদের মাথা ‘উঁচুই’ হচ্ছে। কালোবাজারিদের পুষ্পবৃষ্টিতেই আজ বেঁচে থাকার শেষ সম্ভাবনাটুকু তাঁরা খুঁজছেন। রাজ্যবাসী নিশ্চয় এই অবাম, অমার্কসবাদী, পুঁজির তোষণকারীদের এসব ঘটনায় আরও স্পষ্টভাবে চিনছেন।

মুর্শিদাবাদে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ডিএম ডেপুটেশন

যত্রতত্র মদ বিক্রি, নারী পাচার, নারী নির্যাতন, মূল্যবৃদ্ধি সহ নেতাই গ্রামে সিপিএমের গণহত্যার প্রতিবাদে এবং হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহের দাবিতে ২০ জানুয়ারি মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে খাগড়ায় বিক্ষোভ মিছিল হয়। কালেক্টরেট মোড়ে পথসভা হয় এবং ডিএম-এর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভানেত্রী কমরেড দিলরুবা বেগম, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস শিউলি আহমেদ, স্নিগ্ধা সেন, সভানেত্রী কমরেড দিলখুসা বেগম এবং সম্পাদিকা কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার।

দারিদ্রের সুযোগ নিচ্ছে পাচারচক্র, রাজ্যে বাড়ছে মহিলা ও শিশু পাচার

রহিম ওস্তাগর লেনের বাসিন্দা বছর পনেরোর পূবালি মণ্ডল, দক্ষিণ কলকাতার একটি নামকরা স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। আর পাঁচটা দিনের মতোই সেদিনও স্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। মেয়েটি বাড়ি ফিরল না। বাড়ির লোকজন স্থানীয় থানায়, পরে লালবাজারের মিসিং পার্সন স্কোয়াডে নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। কিন্তু এখনও কোনও খোঁজ নেই পূবালির। বাড়ির লোকজন প্রায় প্রতিদিন বৃথাই হত্যে দিচ্ছেন লালবাজারে। শুধু পূবালিই নয়, তার মতো একইভাবে বছরের পর বছর হন্যে হয়ে ঘুরছেন অবিনাশ ব্যানার্জি লেনের বাসিন্দা চিরশ্রী ঘোষ, ডায়মন্ডহারবার রোডের দীপিকা দাস অথবা ডি এল খান রোডের বাসিন্দা কমলেশ বণিকের বাড়ির লোকজন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের জহুরা বিবির মেয়ে গত বছর নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার জন্য নির্বিকার প্রশাসনকে চাপ দিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এই মামলা সূত্রেই হাইকোর্টের নির্দেশে গত মাসে রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, শুধু গত বছরই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় আড়াই হাজার কিশোরী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ৪ বছরে মোট ৬০ হাজার ৩৭৪ জন মহিলা ও শিশু নিখোঁজ হয়েছে।

এরা কি সবাই স্রেফ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে, নাকি পাচার চক্র তাদের অপহরণ করছে? সম্প্রতি মুম্বইয়ের যৌনপল্লি থেকে কিছু মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৫ জনই এ রাজ্যের। দরিদ্র পরিবারের এই মেয়েগুলিকে ‘কাজ’ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া গোসাবার এক তরুণীর বাবা জনমজুর। বছর তিনেক আগে মা মারা গেছেন। পাশের গ্রামের এক পরিচিত ব্যক্তির কথায় কাজের খোঁজে মেয়েটি মুম্বই গিয়েছিল। দিন চারেক সেখানকার একটা বস্তিতে থাকার পরে একদিন রাতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় যৌনপল্লিতে। সেখান থেকে আজও সে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া অসংখ্য মেয়ের জীবনে।

গত কয়েক বছরে বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের নিখোঁজের যে তালিকা রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিবের কাছে কলকাতা পুলিশ সম্প্রতি পাঠিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১০-এর ৩০ জুন পর্যন্ত কলকাতায় নিখোঁজ ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের মোট সংখ্যা ৮৫২৯। তাদের মধ্যে ৫২৩৫ জনের হদিশ মিললেও ৩২৯৪ জনের কোনও হদিশ এখনও নেই। অনেকেরই আশঙ্কা, প্রতিটি নিখোঁজ শিশু ও মেয়ে পাচার হয়ে গেছে।

নিখোঁজ বা পাচার হওয়া শিশু ও মহিলাদের বাড়িগুলির আর্থিক পরিস্থিতি কেমন? দেখা গেছে, এদের অধিকাংশই নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের। গরিব এই মেয়েগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পেটের দায়ে পাচারকারীদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। মোটা টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দেখিয়ে দালালরা তাদের নিয়ে গিয়ে ভিন রাজ্যে বিক্রি করে দেয়। অনেক সময় বিয়ের নাটক সাজিয়েও পাচার করা হয় অসহায় মেয়েদের। দেখা গেছে, রাজ্যের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির মেয়েরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে। গরিব, অসহায় বাবা-মা ভাবেন, মেয়েটির হয়তো বা একটা হিল্লে হয়ে গেল। না খেতে পেয়ে মরতে হবে না অন্তত। বাস্তবে যৌনপল্লীর কদর্য পরিবেশে অমানুষের জীবন বরাদ্দ হয় মেয়েগুলির জন্য। অত্যাচারের কারাগারে মাথা কুটে মরা ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না তাদের। বাড়ি ফিরে আসার পথও বন্ধ হয়ে যায়। শিশু পাচারের কারণও চরম দারিদ্র। শুধু পেট ভরাবার দুটো পয়সার জন্য জন্মদাত্রী মাকেও এমনকী নিজের আত্মজকে বিক্রি করে দিতে হয়। এর পরেও সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীদের, তাঁদের পেটোয়া কলমচীদের এ দেশের উন্নয়নের বর্ণনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে বা পাতার পর পাতা লিখতে লজ্জা হয় না।

দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এক দল পিশাচ যে নারী পাচার, শিশু পাচারের মতো অমানবিক কাজ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে, দেশের পুলিশ-প্রশাসনের তা জানা নেই এমন নয়। অথচ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, বহু সময় পাচার হওয়ার খবর দিলেও পুলিশ কিছু করে না। অভিযোগ নথিভুক্ত পর্যন্ত করে না। কেন এমন হয়? আসলে পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে অনেক রাঘববোয়াল, যাদের মধ্যে আছে বহু প্রভাবশালী মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি, ক্ষমতাসীন দলের নেতা-নেত্রীরা পর্যন্ত। পাচারকারীরা যে বিপুল টাকা উপার্জন করে তার একটা বড় অংশ ক্ষমতাসীন দলের নেতা-মন্ত্রী ও পুলিশের বখরা হিসেবেই যায়। অনেকেরই হয়ত মনে আছে, ৯০’-এর দশকে বৌবাজার বিস্ফোরণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত রশিদ খানের ডায়েরিতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এক প্রভাবশালী মহিলা নেত্রীর নাম পাওয়া গিয়েছিল। তিনি তাঁর রশিদ ভাইয়ের কাছে বহু অসহায় মেয়েকে পাঠিয়ে তাদের ‘কাজের’ ব্যবস্থা করতে বলতেন। এই মেয়েদের জন্য কী ধরনের কাজের ব্যবস্থা কুখ্যাত ক্রিমিনাল রশিদ খান করত, তা বোঝা কঠিন নয়। এবং সে কাজে মদত জুগিয়ে গেছেন রাজ্যের শাসক দলেরই এক নেত্রী, দুঃস্থ মহিলারা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে যাঁর কাছে এসে পরম বিশ্বাসে যে কোনও একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করত।

সম্প্রতি সিপিএমের সেই নেত্রীই নারী পাচার রুখতে নতুন এক দাওয়াই বাতলেছেন। তিনি বলেছেন, পাচার হওয়া মেয়েদের সংখ্যা কমে যাবে, যদি গ্রামের পঞ্চায়েতগুলিকে জানিয়ে তারা বাইরে কাজে যায়। প্রথমেই তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হল, নারী পাচারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলার নৈতিক অধিকার তাঁর আছে কি? এত সহজে তিনি এই গুরুতর সমস্যাটির সমাধান বাতলে দিয়েছেন, অথচ ৩৪ বছর ধরে রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তাঁর দল নিয়ন্ত্রিত পুলিশ-প্রশাসন এ ব্যাপারে অপদার্থের ভূমিকা নিল কেন, এ প্রশ্ন তিনি কোথাও তুলছেন না কেন? আসলে বিপুল সংখ্যক নারী-শিশু পাচারের ঘটনায় সিপিএম সরকারের অপদার্থতার চেহারাটা যখন কোনও ভাবেই আর আড়াল করা যাচ্ছে না, তখন এ সব কথা বলে এইসব নেত্রীরা সাধু সাজার চেষ্টা করছেন। তা ছাড়া পঞ্চায়েতের যে কর্তাব্যক্তিরা শাসক দলের নিয়ন্ত্রণে নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্বগুলি পালন করতে পারে না, চুরি-দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তারা এ ধরনের একটা জটিল সমস্যার সমাধান করবেন তা আশা করা যায় কি?

এই অবস্থায় নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ করতে এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গড়ে সাধারণ মানুষকেই সক্রিয় হতে হবে। কোথাও পাচারের ঘটনা ঘটলে আন্দোলনের চাপে পুলিশ-প্রশাসনকে বাধ্য করতে হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে। গোটা দেশ জুড়ে সেই লড়াই-ই চালিয়ে যাচ্ছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। উন্নত রুচি-আদর্শের ভিত্তিতে এই সংগঠনের সদস্যরা অসহায় মহিলাদের স্বার্থে লড়াই করছে। অনেক জায়গায় সদস্যরা এমনকী প্রবল ঝুঁকি নিয়েও পাচার হওয়া নারী-শিশুদের উদ্ধার করছে, ধরিয়ে দিয়েছে পাচারকারীদের। বহু জায়গাতেই সংগঠনের আন্দোলনের জেরে রুখে দেওয়া গেছে নারী-শিশু পাচার। এই লড়াই আরও জোরদার করতে সাধারণ মানুষকেও সামিল হতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বুর্জোয়া শাসন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন

খালেকুজ্জামান

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এদেশে এলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁকে কিছু বলার জন্য এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। সেই মতো ১৩ ডিসেম্বর '১০ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে একটি সভায় তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন। কয়েকটি কিস্তিতে তা আমরা প্রকাশ করছি।

দ্বিতীয় কিস্তিতে আলোচিত হয়েছে — ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পাকিস্তান অংশে কমিউনিস্ট ধারা, মওলানা ভাসানীর ভূমিকা, সমাজতন্ত্রের চেতনা, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, আওয়ামী লীগ, '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামিরক শাসন, জাসদের ভূমিকা, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বাসদের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। এবার তৃতীয় কিস্তি।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বাসদ গড়ে তোলার সময় আমরা বলেছিলাম, শুধু জাসদ নয়, দেশে বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যাগুলো কী?

কেন অন্য দল নয়, কেন বাসদ? এখানে আমরা ৪টি প্রধান সমস্যাকে চিহ্নিত করেছিলাম। প্রথমত, মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিজনিত ঘাটতি। দ্বিতীয়ত, জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রাম। স্ট্যালিন কথাটা বলেছেন সাধারণভাবে, আর সেই শিক্ষা নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন পয়েন্ট করে বলছেন, তখন তার তাৎপর্য ভিন্ন হয়ে যায়। আমরা বললাম, সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রাম। তৃতীয়ত, বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ। অর্থাৎ যে সমাজে বিপ্লব করবেন, সেই সমাজের বিশ্লেষণটা কী, রাষ্ট্রের চরিত্র, উৎপাদনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কী তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা দরকার। তা না হলে রোগ যদি হয় ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডের চিকিৎসা করে কি লাভ হবে? এর সঙ্গে চতুর্থ বিষয় হিসেবে আসে দল গড়ার নীতিগত এবং পদ্ধতিগত সংগ্রামটা কেমন হবে। মূলত এ চারটি বিষয়, তার সঙ্গে ছোট মাত্রার অন্যান্য বহু বিষয় আছে। কিন্তু এই চারটি বিষয়ের যে ঘাটতি, যে বিচ্যুতি, সেটাই এদেশে অতীত দিনে বামপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। জাসদও এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তার থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম করেনি। আমরা সেগুলো করে ফেলেছি, এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। আমরা সমস্যাটা চিহ্নিত করেছি, সমস্যামুক্ত হয়ে এগোবার চেষ্টা করছি। বাস্তবে এ অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু বড় কথা হল, আমরা সমস্যা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। জানি না শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হব।

প্রথম বিষয়ে আসি, অর্থাৎ মূল দৃষ্টিভঙ্গি। এগুলো নিয়ে বামপন্থী পার্টিগুলোর সঙ্গে আমাদের কথা হয়। আলোচনা করতে একটু সমস্যা হয়, কারণ এসব নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় ইগোর সমস্যা তৈরি হয়ে যায়। কারণ তারা হয়ত মনে করে, এরা আমাদের শেখাতে এসেছে। আর আমরা তো যখন পার্টি তৈরি করি, আমরা ছিলাম আট-নয় নম্বরে। ট্রাডিশনাল ধারণা অনুযায়ী আমরা মস্কোপন্থীও না, পিকিংপন্থীও না। অনেকে তো মনে করেছেন, আমরা আওয়ামী লীগ-জাসদ-বাসদ এই ধারার। শক্তির দিক থেকেও তারা ছিল এগিয়ে। আবার জাসদ থেকে যখন বেরিয়ে আসি, নামকরা নেতা দশ জনের একজনও আসেনি আমাদের সঙ্গে। শহিদ মিনারে গিয়ে যখন আমরা শপথ নিলাম তখন আমাদের সম্বল বর্তমান যুগের সবচেয়ে অগ্রসর মতাদর্শ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধ্যান-ধারণা, আর আমাদের দৃঢ় সংকল্প। আমাদের ভাবনায় ছিল, আজকে লোক কতজন আছে, এটা বড় কথা নয়, আমরা নৈতিক-আদর্শিক শক্তির জোরে দেশে একটা বিপ্লবী শক্তি দাঁড় করাতে সক্ষম হবই। আমাদের সবার কাছে সাকুল্যে ৩৮ টাকা আছে। বসার জায়গা নেই, একটা রিক্সা সাইকেলের ওয়ার্কশপ বা গ্যারেজ — সেই গ্যারেজে গিয়ে বসতে হল আমাদের। এই অবস্থা থেকে শুরু। আরও ৮-৯টা শক্তিশালী বামপন্থী দল, তাদের পশ্চাতে আমাদের অবস্থান।

সে সময় থেকেই আমরা এদের সঙ্গে স্ট্রাগলটা শুরু করলাম। বিভিন্ন কথায়, আলোচনায়, কিছু লেখায় তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেগুলিতেও আমাদের দুর্বলতা অনেক। পাবলিকেশনে আমাদের ভীষণ ঘাটতি আছে, লেখার লোকের অভাব বা যে বিষয়গুলো যেভাবে যতখানি বুঝি, সেটাও আনতে পারি না মানুষের মধ্যে। আমরা যখন বিষয়টি তুললাম, তখন ওরা বলছে যে, কেন আপনারা এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন তুলছেন? আমরা বললাম, দেখুন, মার্কসবাদ অনুযায়ী আপনারা তো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মার্কসবাদ। আপনারা কী বলছেন? ইন্টারনাল কজ (আভ্যন্তরীণ কারণ) হলো ডিসাইসিভ, নিয়ামক, এক্সটার্নালটা (বাহ্যিক) হচ্ছে শর্ত — এটা তত্ত্বে বলে। আর '৭১ সাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনারা বলেন যে, এদেশ আমেরিকা এবং পাকিস্তানের অধীনে ছিল, বাস্তবে আমেরিকার দখলে ছিল, পাকিস্তান ছিল ম্যানেজার, এখন এটা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার দখলে গেছে থ্রু ম্যানেজার ইন্ডিয়া। আপনাদের এই মূল্যায়নটা কী রকম? তাহলে বাংলাদেশের জনগণ, ২৩ বছর ধরে তাদের রোল কী? এখানে মানুষের সংগ্রাম কী? তাহলে এই ২৩ বছরে কি কিছুই ঘটেনি? ১৯৬৫ সালে তো সহজ ছিল দখল করে নেওয়াটা। কেন ভারত নেয়নি? তাহলে ইন্টারনাল কজ, সেটাকে আপনারা ব্যাখ্যা করলেন না। সেই '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান — এগুলো প্রধান ঘটনা। তারপর এমন একটা মাস দিন যায়নি, যেদিন জনগণ লড়েনি। সেই লড়াই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের এই পরিণতি এল, সেটাকে বাদ দিয়ে এ ধরনের ব্যাখ্যা যখন করেন, তার সঙ্গে মার্কসবাদের কী সম্পর্ক আছে? এটাকে আমরা বলছি দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা। মার্কসবাদের আরেকটি মূল সূত্র হল ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অফ অপোজিটস। আপনারা বলছেন, আপনারা কমিউনিস্ট পার্টি — এখানে সিপিআই-এর সাথে মিল ও যোগাযোগ আছে। যখন আপনারা বলেন, আওয়ামী লীগ একটা প্রগ্রেসিভ পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে সম্পূর্ণ করতে পারব, এমনকী, সমাজতন্ত্রের পথেও খানিকটা অগ্রসর হওয়া যাবে — এটা কী ধরনের ব্যাখ্যা? তাহলে আওয়ামী লীগের ক্লাস ক্যারেক্টার কী? একটা বুর্জোয়া দল, আজকের দিনে তার সঙ্গে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবেন — এটা কোথায় পেয়েছেন? লেনিন তো সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেছেন। আবার অন্যদিকে আর এক দল, মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে দিলেন। বললেন, ইন্ডিয়ান আর্মি দেখা যাচ্ছে, যেটা চোখে দেখি সেটা অস্বীকার করি কী করে? সুতরাং এখনই জনযুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তাঁরা মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন, স্বাধীনতার লড়াই শুরু করলেন। আর এরা, আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করবেন ও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবেন। আমরা বললাম, দুই দিকে দুই এক্সট্রিম। কিন্তু আপনারা দুই অংশই ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অফ অপোজিটস-এর বিকৃত ব্যাখ্যা করছেন। আমরা ট্রেড ইউনিয়ন করি, পার্লামেন্ট ইলেকশন করি, সভা-সমাবেশ করি। ট্রেড ইউনিয়ন করি, অ্যাজ এ স্কুল অফ কমিউনিজম হিসাবে দেখার জিনিস এটা। আর মালিকের সঙ্গে বার্গেইন করে যে আপস-রফায় যাই তা আলটিমেটলি মালিকি ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য ওয়ান স্টেপ ব্যাক। কিন্তু এই মালিকের সঙ্গে মিলে শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক সমস্যার সমাধান করা, এটা আমরা বলি না। ফলে এক পক্ষ বুর্জোয়া দলের সঙ্গে জোট বেঁধে, এক পর্যায়ে দল বিলুপ্ত করে একদলীয় বাকশাল-এ লীন হয়ে গেলেন এবং অন্য পক্ষ ভারতীয় দখল-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ভারতীয় সৈন্য কিছুদিনের মধ্যে চলে গেল, আর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত লড়তে গিয়ে বহু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মীকে জীবন দিতে হলো।

এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে যা বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি, এইভাবে মূল দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি। আর জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রামের গুরুত্ব প্রশ্নে আমরা বলেছি যে, আমরা আদিম যুগের গুহাবাসী নই। এখন সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, পরিবার, আবেগ, রুচি, ভালবাসা কত কিছু মানুষের জীবনের ডেভেলপ করছে। প্রত্যেকটাই জীবনের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে। তাহলে সমাজের আমূল পরিবর্তনটাই যদি বিপ্লব হয় তাহলে তা শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি, অর্থনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে সীমিত থাকবে না। এভাবে ভাবাটাও বিপ্লব সম্পর্কে কোনও সঠিক ধারণা নয়। তাহলে, যা কিছু জীবনকে, জীবনবোধ-রুচিবোধকে প্রভাবিত করে, সে যে ক্ষেত্রেই হোক, তা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার অনুকূলেই হয়। সুতরাং সমাজ পাল্টাবার সংগ্রামে তাকে প্রতিহত করা, মোকাবিলা করা ছাড়া বিপ্লবী সংগ্রাম, বিপ্লবী অভ্যুত্থান আন্দোলন সম্ভব না — এই কথাই আমরা বলেছি।

আমাদের কথা শুনে অনেকেই বলত আমরা নাকি কট্টর, কতকগুলি অবাস্তব কথা বলি। কেউ কেউ ব্যঙ্গ বিদ্রুপও করেছেন। একজন নেতা একদিন বলছেন, আপনারা এইসব কথা বলেন, বাস্তবতার সঙ্গে আপনাদের কোনও মিল নেই। রিক্সায় উঠে তিনি ঘন্টা নিয়মে ভাড়া করলেন। তিনি একটি বিত্তশালী পরিবার থেকে এসেছেন। আত্মীয়রা, ভাইরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলছেন, আমার স্ত্রীকে আমার ভাইয়ের বৌ'রা যখন শাড়ি দেয়, ৫০০০ টাকার শাড়ি দেয়। তাহলে আমার স্ত্রী যদি ২০০০ টাকা দামের শাড়ি দিতে না পারে, ওর মনটা খারাপ হয়ে যায় না? ওদের ছেলেমেয়েরা গাড়িতে যায়। আমার মেয়ে গাড়িতে যেতে পারে না বলে ইস্কুলে যেতে চায় না, মুখ ভার করে বসে থাকে। এটার জবাব কী? বললাম, এটার জবাব তো আপনি নিজেই। আপনার স্ত্রী এ কথা ভাববে কেন? আমি তো তাকে একদিন দেখেছি রাজপথে মিছিল করতে। তাকে তো দেখেছিলাম, পুলিশ মেরে রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছে। সেই মহিলার এই দুর্গতি কেন? আর ভাইরা তো দেবেই। আপনি একটা বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করছেন। পাল্টা আপনি দেবেন কীভাবে? আর মেয়েকে সে শিক্ষা দেননি কেন? উনি বললেন, এইসব কথা বললে তো আমার পরিবার ছাড়তে হবে। বললাম, পরিবার আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে বহু আগেই। আপনি আত্মসমর্পণ করে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে আছেন। এই ধরনের কিছু কথাবার্তা ওদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে হয়।

এরপর সমাজ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ। সেখানে তাদের বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক। কারণ তাদের মতে, রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া। মুৎসুদ্দি কী? কমিশন এজেন্ট। বলার চেষ্টা করলাম যে, ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা আছে কি, যে কমিশন এজেন্টরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করে? এটা বাদ দিলেও একটা দলের শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্নে দলটার উত্থানের পটভূমি কী? কোন শ্রেণীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়ে দলটা হাজির হয়েছিল? ১৯৪৯ সালে, আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার কালে তার কী রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল? কী অর্থনৈতিক কর্মসূচি ছিল? কোন শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষাকে সে সামনে তুলে ধরেছিল? আসুন বসি, বিশ্লেষণ করি। এবং পরবর্তীকালে ছয় দফা থেকে শুরু করে '৭১ সাল পর্যন্ত কোন শ্রেণীর স্বার্থকে সে আপহেল্ড করেছে? পাকিস্তান, আমেরিকা, ইন্ডিয়া, না বাংলাদেশের উঠতি ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ — কোনটা? আর কোন সংস্কৃতিকে সে পরিচর্যা করেছে। সঙ্গীত হোক, নাটক-সাহিত্য হোক, অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও কোন শ্রেণীর অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক স্বার্থকে সে সামনে তুলে ধরেছে? এগুলি বিশ্লেষণ করা ছাড়া, শুধু মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বলে দিলে হয় নাকি? আবার দেখুন, এদের বিপ্লবটা জনগণতান্ত্রিক কিংবা জাতীয় গণতান্ত্রিক। মানে কি? অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হয়নি। তারা দেশকে স্বাধীনও করবেন, সমাজতন্ত্রও করবেন। কিন্তু বক্তৃতা করার সময় বলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও কেন এই দাবি ওই দাবি পূরণ হল না' ইত্যাদি। দেশই যখন স্বাধীন হয়নি তাহলে স্বাধীনতার ডাক দিচ্ছেন না কেন? তাহলে সমাজবাস্তবতা ও তত্ত্ব মিলছে না।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় লঘু পরিহাসটা হয়ত ঠিক হবে না, তাও বলি। অনেক সময় ওদের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করতে অসুবিধা হয়। যদি ভেবে বসেন যে তাদের তত্ত্ব শেখানো হচ্ছে তাহলে আলোচনা-সমালোচনার পরিবেশই নষ্ট হয়ে যায়। তখন ভাবলাম, দু'একটা গল্প বলি। বললাম, শুনুন, একবার বিড়ালের একটা দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল। আমেরিকা-ইউরোপের বিড়ালগুলো সব তাজা, সেগুলি এসেছে। সোমালিয়ার একটি বিড়াল এসেছে। বিড়ালটা অতটা মোটা-তাজা নয়, কিন্তু চিকনা শরীর নিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেল। তো সাংবাদিকরা ধরেছে, কী ব্যাপার, তুমি ফার্স্ট হলে কী করে? সে বলে, ভাই আমি আসলে বিড়াল না, আমি বাঘ। না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে গেছি। তো বাংলাদেশের বুর্জোয়ারাও বুর্জোয়া, না খেয়ে না খেয়ে এদের শুকনো চেহারা হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের সাথে এদের হুবহু মিল থাকবে কীভাবে?

তারপর এল দল গড়ার নীতিগত ও পদ্ধতিগত প্রসঙ্গ। বললেন, লেনিন সব বলে গেছেন। শিবদাস ঘোষ কিছু মনগড়া কথা বলে গেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, লেনিনের চিন্তার বিরুদ্ধে কী বলেছেন, বলুন তো। লাইনে লাইনে শব্দে মিল না হলে যদি বিরুদ্ধ চিন্তা হয়, তাহলে লেনিন তো মার্কসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এর বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে। মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তার বিপরীত অনেক কথা আছে। সেগুলি বিপরীত তো নয়ই, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পরিপূরক। তাহলে লেনিন যে কথা বলেছেন, সেটা বাতিল হয়নি বরং লেনিনীয় নীতির ওপর দাঁড়িয়ে এবং শিক্ষা নিয়ে শিবদাস ঘোষ যে কথা বলেছেন, আসুন সেটা নিয়ে তর্ক করি। এবং বুঝবার চেষ্টা করি তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত কিনা। বিজ্ঞানসম্মত কিনা, বিপ্লবে, বিপ্লবী সংগ্রামে, পথ দেখায় কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়।

এরপর আসছে, আমাদের রাষ্ট্রের চরিত্র। এটা কি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র না নয়া ঔপনিবেশিক কিংবা আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র? আজ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ একসূত্রে গাঁথা। জাপানের ওকিনাওয়াতে ১২ বছরের কিশোরী ধর্ষিত হওয়ার পরে আমেরিকার সৈন্যদের জাপানিরা অ্যারেস্ট করতে পারেনি, বিচার করতে পারেনি। ওটা কি কলোনি? জার্মানিতে মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে জার্মানির কোনও নাগরিক ঢুকতে পারে না। ইংল্যান্ডের রানির ভোটে অস্ট্রেলিয়ার রানি নির্বাচিত হয়। তাহলে এগুলি কী বলবেন? আমাদের এখানে ইকনমি যদি বলেন, জিডিপি ২ শতাংশও হবে না ওরা যেটা নেয়। এখন তিনটে ক্যাটেগরি আছে — ডিরেক্ট ফরেন

পাঁচের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বুর্জোয়া শাসন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন

চারের পাতার পর

ইনভেস্টমেন্ট, জয়েন্ট কোলাবরেশন, ও দেশি প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি নয়। আর আমাদের এখানে জিডিপি প্রায় ৬ থেকে ৭ লক্ষ কোটি টাকা। ইকনমির এই চেহারা। তারপরে পলিটিক্যাল ডমিনেশন তো থাকবেই। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় পুঁজিপতি শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে, বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে গ্রাস করতে চায়, বড় সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল পুঁজিবাদের ওপর ছড়ি ঘোরায়। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের নির্ভরশীলতা যেমন আছে, আঁতাত আছে, তার সঙ্গে তার বিরোধ, তার নিজের জাতীয় বিকাশের প্রশ্নও আছে।

তারপরে যে কথাটা আসছে, তাহল, সমাজতন্ত্রের সৈনিকদের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে জীবন নির্মাণের জন্য যৌথ জীবন গড়ে তোলা আবশ্যক। আমরা পার্টি করলাম ১৯৮০ সালে, ’৮২ সালে জারি হল মার্শাল ল’। হুসেন মুহম্মদ এরশাদ মিলিটারি শাসন জারি করে দিল। একে তো কিছুই আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, মাত্র দল গড়ে তোলার যাত্রা শুরু করেছি, সে সময় মিলিটারি শাসন। তারপর পলাতক জীবন শুরু হয়ে গেল। এই পরিস্থিতির মধ্যে দলের কিছু নেতা বলে বসলেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রাম সম্ভব নয়। কিছু করলেন কুযুক্তি — ফুলের সৌন্দর্যের মধ্যে আর শিশুর হাসির মধ্যে আবার কী শ্রেণী? এমন নানা কথা। এগুলি নিয়ে আমরা তখন বলার চেষ্টা করেছি যে, ফুলের সৌন্দর্য হোক আর শিশুর হাসিই হোক, তার প্রকাশে শ্রেণী নেই, কিন্তু সেটা অনুভবের মধ্যে শ্রেণী-সংস্কৃতির বিষয় রয়েছে। আবার একঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে লোক থাকলে সেটা কী কমিউন হয়? যৌথজীবন মানে তা নয়। পুলিশ ব্যারাকে তো সবাই পাশাপাশি ঘুমায়। এটাকে কি আমরা যৌথজীবন বলি? আসলে একটা জীবন নির্মাণের জন্য একটা সংগ্রামের মর্ম বাদ দিয়ে যৌথজীবন কথাটার মানে দাঁড়ায় না। তারা বললেন, তা সম্ভব নয় তার চর্চাও নিষ্ফল। কিছু নেতা দল ছেড়ে চলে গেলেন। অসম্ভবের প্রশ্নটিরও মীমাংসা হওয়া দরকার। আমি কোনও বিশেষ সংগ্রামে সফল নাও হতে পারি, বা কোনও এক বিশেষ সংগ্রাম আমি না-ও করতে পারি। আমি পারলাম কি না, এ দিয়ে সত্য নির্ধারিত হয় না। সত্য নির্ধারিত হয় সত্যের মানদণ্ডে। আমি পারব কি পারব না, এটা কোনও মানদণ্ড হয় না। আমি না পারলে অ্যাজ অ্যান অনেস্ট ম্যান, কনফেস করব যে পারলাম না। কিন্তু আমি পারব না বলে অন্যের এগোবার রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করব না। তারই মধ্যে শুরু হল সামরিক শাসনবিরোধী সংগ্রাম।

প্রশ্ন এল, সামরিক শাসনের অধীনে আমরা নির্বাচনে যাব কিনা। আমরা বললাম, এ দেশের মানুষের দীর্ঘকালের সামরিক শাসনের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া অতীত দিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতায় মানুষ বারে বারে দেখেছে এরা সবাইকে পাতানো নির্বাচনের ফাঁদে এনে এবং সাজানো পার্লামেন্ট বসিয়ে কীভাবে অবৈধ ক্ষমতার বৈধ রূপ দেয়। আজ এরশাদ এসে বলছে, শহিদ মিনারে কোরান তালাওয়াত হবে এবং মিলাদ হবে। এভাবে শহিদদের আত্মার মাগফেরাতে কামনা করা হবে। চিন্তা করুন অবস্থা! তখন আমরা সব রাজনৈতিক দলগুলিকে ডেকে বলেছি, যে কোনও মূল্যে এটা ঠেকানো দরকার। এটার সঙ্গে আমাদের একটা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমস্ত বিষয় যুক্ত। এরা আমাদের অতীতের সব অর্জন ধ্বংস করে ফেলবে। আমরা ১৫ দল গঠন করে তার বিরুদ্ধে লড়লাম। এবং পরবর্তীকালে তারা শহিদ মিনারে মিলাদ-টিলাদ করতে সাহস করল না। আবার যথারীতি আমরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। জনতার বাঁধভাঙা স্রোত নামল। ২১শে ফেব্রুয়ারি আবার একটা নতুন সংগ্রামী প্রেরণা নিয়ে যেন হাজির হল।

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই মার্শাল ল’ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে আমাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সহ দু-একটি বাম দলের বিরোধ শুরু হয়ে গেল। আমরা বললাম, আন্ডার মার্শাল ল’ আমরা কোনও ইলেকশনে যাব না। সামরিক শাসনকে কোনওভাবে বৈধতা দেওয়া যাবে না। তারা প্রহসনের ইলেকশন করুক, কিন্তু আমরা কেন বৈধতা দিতে যাব? প্রথম সবাই এটায় রাজি হলেন, কিন্তু ’৮৬-তে আওয়ামী লীগ সি পি বি সহ দু-তিনটি বামদলকে সাথে নিয়ে চলে গেল। ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর জোট ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে ‘সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য’ গঠিত হয়েছে। সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে ‘শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ’ গঠিত হয়েছে। সমস্ত কৃষক সংগঠনকে নিয়ে ‘কৃষক সংগ্রাম পরিষদ’, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে ‘সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট’ তারপর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ এদের সংগঠন, মোর্চা — এভাবে যখন জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সংগঠিত শক্তি, তাদের সংগঠন গড়ে উঠছে, আন্দোলন দিন দিন জোরদার হচ্ছে, এরা ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে এবং সামরিক শাসকদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগির জন্য ’৮৬-তে তারা ইলেকশনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বি এন পিও সেই পথে হাঁটত। কিন্তু ক্ষমতা বৈধ করার জন্য জিয়াউর রহমানের কায়দায় বিএনপি-র মতো ক্ষমতায় বসে এরশাদের বানানো জাতীয় পার্টির জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সিট দরকার, তারপর না ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপার। এ ভাগাভাগিতে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দু’জনের কার ভাগে কত আসবে এই হিসাবে বিএনপি থমকে দাঁড়ায়।

প্রথমে আমাদের দল নির্বাচন বর্জনের কথা বলে এবং ১৫ দলে তা উত্থাপন করে। আরও চারটি বাম দলও একই অবস্থান গ্রহণ করে। ওই সময় এরশাদ বলেছিল, ভোর পাঁচটার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাত্রি যখন দুটো বাজে তখন আমরা বললাম যে আমরা নির্বাচনে নেই। জানি না, ঘর থেকে বেরোলেই গুলিও করতে পারে, জেলেও নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা প্রহসনের নির্বাচনে যাব না। পাতানো নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, সিপিবি, সাম্যবাদী দল ইত্যাদি গেল। বিএনপি যখন দেখল যে আমরা যাইনি, তখন ওরাও আর যায়নি। এরশাদ-আওয়ামী লীগ-বিএনপি — তিনজনে মিলে ভাগাভাগি করবে কী করে? দু’জনে ভাগাভাগি হবে। সেজন্য ওরা আর গেল না। আন্দোলন তুঙ্গে উঠল, পার্লামেন্ট অকার্যকর হয়ে গেল। এরশাদের বৈধতা প্রহসনের রূপ পেল। আন্দোলনের তোড়ে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্ট থেকে বেরিয়ে এল। আন্দোলন আরও গতিশীল হল এবং শেষ পর্যন্ত এরশাদের পতন হল। আমরা প্রথম দিকে তদারকি সরকার গঠনের পক্ষে ছিলাম, কিন্তু শেষ দিকে এসে বললাম যে, অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিজয়ী আন্দোলনকারী শক্তির একটা সরকার গঠন করতে হবে। এবং যে দাবিগুলি উঠেছে এরশাদ-স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময়, সেই সমস্ত দাবি বাস্তবায়িত করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তিন জোট — আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট ও আমরা সহ বামপন্থীদের ৫ দলীয় জোট — মিলে একটা গভর্নমেন্ট করলে বুর্জোয়ারা যখন সর্বস্তরের জনগণের উত্থাপিত দাবি পূরণ করতে পারত না, তখন এক পর্যায়ে গিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে ব্রেক করে জনগণের উত্থাপিত দাবির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়ে বেরিয়ে এসে বামপন্থার একটা আলাদা স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হতে পারব। কিন্তু আমাদের বামপন্থী বন্ধুদের একমত করাতে পারিনি। কিন্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, আমাদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে এভাবেই পরিষ্কার হয়ে আসছে। আন্দোলন ছাড়া তো সে জিনিসকে পরিষ্কার করা যায় না। কথায় তাদের সঙ্গে আমরা পারব কীভাবে, সবাই তো কথা জানে। কিন্তু একটা আন্দোলন হচ্ছে অনেকটা ল্যাবরেটরি — পরীক্ষাগার। ফলে এভাবে আমাদের স্বাতন্ত্র্যটাকে আমরা কিছুটা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এখন আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের আগ্রহ, আপনারা যেটা জানতে চান, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলি। গত পরশু পুলিশ চট্টগ্রামে গুলি করে তিনজন শ্রমিককে মেরে ফেলেছে। এরা গার্মেন্টসের শ্রমিক। আমাদের যে পাটকল-সুতাকল-চিনিকল, সনাতনী শিল্পগুলি যার কাঁচামালের জোগান এবং ভোগবাজার দুটোই ছিল বাংলাদেশে, ওরা সব ধ্বংস করে দিয়েছে। জাতীয় চাহিদার উদ্বৃত্ত হতে পারত রপ্তানির বিষয়। কিন্তু তা না করে দেশের মানুষকে ভুখা-নাঙ্গা রেখে শুধুই রপ্তানিমুখী পথে চলা শুরু হল কথিত বিশ্বায়নের ফর্মুলা ধরে। কাপড় আসবে বাইরে থেকে আর পরবেও আমেরিকা-ইউরোপের লোকেরা, আমরা দর্জিগিরি করব, এটাই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি। এর মধ্যে মুনাফা কী রকম জানেন? ১৯৭৮ সালে দুটো কারখানা গড়ে উঠেছিল দেশে, এখন ৫১০০ গার্মেন্টস কারখানা। এবং গত ২০০৯ সালে ১২ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে এখানে। তার মানে বাংলাদেশি টাকায় ৮৪ হাজার কোটি টাকা। প্রথম এক্সপোর্টিং কান্ট্রি হচ্ছে চীন, তারপর তুরস্ক, তারপর বাংলাদেশ। তুরস্কে ঘণ্টা প্রতি শ্রমিকদের মজুরি হচ্ছে প্রায় আড়াই ডলার, চীনে ১.৮৮ ডলার, আর বাংলাদেশে ১২.৫ সেন্ট। ভারত, পাকিস্তানে প্রায় ৫০ সেন্টের মতো, কম-বেশি প্রায় চার গুণ। এটা নিয়েও আমরা প্রশ্ন তুলেছি যে, মজুরি কী হবে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি যে, বিশ্বব্যাঙ্ক দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করার জন্য বলছে, দৈনিক আয় দুই ডলার হতে হবে। তার মানে ১৪০ টাকা যদি হয়, চার জনের পরিবারে মাসিক আসে ১৬ হাজার ৮০০ টাকা। বিশ্বব্যাঙ্ক, যারা দুনিয়া লুট করে বেড়ায়, তারাও একটা চরম দারিদ্র্যসীমার উপর থাকতে হলে যে প্রেসক্রিপশন করে, সে অনুযায়ী ৪ জনের পরিবারে ১৬ হাজার ৮০০ টাকা লাগে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষ্টিবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট বলছে যে, দৈনিক একজন মানুষের ৩ হাজার কিলো ক্যালরি লাগে। তারা পুরুষ, নারী এবং শিশু আলাদা করেছে — যেমন পুরুষ ৩৩৬০, নারী ও অল্পবয়স্ক ২৪০০, এরকম ভাগ করেছে। কিন্তু গড়ে ৩ হাজার কিলোক্যালরি। এই ক্যালরি পূরণের জন্য সাধারণ খাবার কিনলেও ৬৪ টাকা ৫০ পয়সা দরকার। তাহলে ৪ জনের পরিবারে ৭৭৪০ টাকা লাগে। শুধু খাবার, অন্য সব বাদ। সন্তান-সন্ততির খরচ, আসা-যাওয়ার খরচ, যাতায়াত খরচ, ঘর ভাড়া এগুলি যুক্ত করুন — ১৪ হাজার ২৪০ টাকার নিচে অসম্ভব। সেখানে আমরা বললাম, দু’জনে যদি চাকরি করে, তাহলে ভাগ করলে ৭ হাজার টাকা বেতন হওয়া দরকার। অন্যেরা এটা মানল না, তারা ৫ হাজার টাকা দাবি করল, আর গভর্নমেন্ট সেখানে ঘোষণা করল ২ হাজার টাকা বেসিক এবং ৩ হাজার টাকা সাকুল্যে।

অথচ ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান আমলে, তখন আমি ট্রেড ইউনিয়ন করতাম, সেজন্য অনেকগুলি ঘটনা মনেও আছে। আন্দোলন যখন হল, আয়ুব খাঁর পতন ঘটল, ইয়াহিয়া এল। মওলানা ভাসানী এর আগে ওখানে শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। আপনাদের প্রয়াত নেতা সুবোধ ব্যানার্জী বোধহয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই পন্থা এনেছিলেন এবং মওলানা ভাসানী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এই ঘেরাও আন্দোলন শুরু করলেন। এই শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে সেদিন ইয়াহিয়া মজুরি ঘোষণা করেছিল মাসিক ১২৫ টাকা বেসিক, সর্বসাকুল্যে ১৫৫ টাকা। তখন এক মণ চালের মূল্য ৩০ টাকা। সেই হিসেবে মাসের মজুরিতে তখন ৫ মণ চাল পাওয়া যেত। এই ছিল ন্যূনতম মজুরি। আর ৪০ বছর পরে আজকের বাংলাদেশে এক মাসের বেতনে দুই মণ চাল কিনতে পাওয়া যায় না। আমরা এই প্রশ্ন তখন তুলেছি, কী স্বাধীনতা আমরা পেলাম? স্বাধীনতার জন্য রক্ত কারা ঢেলেছে? যারা আজকে মন্ত্রী, যারা এমপি, জেনারেল, কেরানি থেকে সেক্রেটারি হয়েছেন, হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, তাদের একজনও কি বলতে পারবেন যে আপনার পরিবারের লোক জীবন দিয়েছে? কোথা থেকে তাহলে এলো ৩০ লাখ শহিদ? এরা দেশের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। যে শ্রমিক সেদিন রক্ত দিয়েছিল, সে পাঁচ মণ চালের জায়গায় দুই মণ কিনতে পারে না। আর আপনাদের ১৬ গুণ, ১৮ গুণ, ২০ গুণ বেতন বেড়েছে। সুযোগ-সুবিধার অন্ত নেই। সারা বছর ক্ষমতাকেন্দ্রিক কোন্দল-কলহে লিপ্ত থাকেন, আবার পার্লামেন্টে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি আমদানির সিদ্ধান্তে সবাই হাততালি দেন। বিদেশে টাকা পাচার করেন। তাহলে স্বাধীনতা কি আপনাদের এই আমিরী করার জন্য? স্বাধীনতার মূল্য দিল কে আর ভোগ করে কে? এ বিষয়গুলি আমরা এনেছি। শ্রমিকদের দাবি আজ বাড়তি কোনও দাবি নয়, হারানো অর্জন ফিরে পাওয়ার দাবি মাত্র। তারপরও মালিকরা সময়মতো বেতন দেয় না, দু’মাস, তিন মাস বেতন বাকি থাকে। এমনিতে ৩ হাজার টাকায় ঢাকা-চট্টগ্রামে টিকে থাকা দায়। তার ওপরে দুর্ব্যবহার, নির্যাতন, মেয়েদের শারীরিক, মানসিকভাবে হেনস্থা করা, ছুতো তুলে ছাঁটাই করা, বেতন কেটে নেওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন না থাকা। জুট ব্যবসায়ীর ওয়েস্ট যেটা বিক্রি হয় — সেই জুট ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা মস্তান বাহিনী খাড়া করে তাদের দিয়ে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালায়। এখন আবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ তৈরি করেছে। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যাওয়ার কারণে গুলি করে চারজন শ্রমিককে হত্যা করেছে। এর আগে গত ২৫ বছরে ১ হাজার গার্মেন্টসের শ্রমিক আগুনে পুড়ে মরেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কোলাঘাটে অবরোধ, দাবি আদায়

ভাঙাচোরা কোলাঘাট-জশাড় পিচ রাস্তার সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজ অবিলম্বে শুরু, জশাড় ব্রিজের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, হ্যামিল্টন এবং খড়িচক সেতু দুটি কংক্রিটের করার দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দলের কোলাঘাট ব্লক-১নং লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ব্লক অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করা হয়। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। অবরোধ স্থলে বিডিও এবং কোলাঘাট থানার ওসি উপস্থিত হয়ে পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের সাথে নেতৃবৃন্দের ফোনে যোগাযোগ করিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাস্তার কাজ শুরুর আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও শংকর মালাকার, মিলন মণ্ডল, মানস সিনহা, নেপাল বাগ প্রমুখ।

বিহারে অ্যাসবেস্টস কারখানা বন্ধের দাবিতে নাগরিক মিছিল

মজফফরপুরের মাড়ওয়ানে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ক্যানসার সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টিকারী অ্যাসবেস্টস কারখানা নির্মাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষকদের সমর্থনে ৯ ফেব্রুয়ারি এক নাগরিক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল থেকে দাবি ওঠে — অবিলম্বে অ্যাসবেস্টস কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে, মিথ্যা অভিযোগে ধৃত তারকেশ্বর গিরি ও কুমোদ রামকে মুক্তি দিতে হবে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর গুলিচালনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি চাই প্রভৃতি। বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের সুরেন্দ্রকুমার, খেত বাঁচাও-জীবন বাঁচাও জনসংঘর্ষ কমিটির কো-অর্ডিনেটর রামচন্দ্র রায়, ব্যান অ্যাসবেস্টস নেটওয়ার্ক অব ইন্ডিয়ার গোপালকৃষ্ণ, এস ইউ সি আই (সি) বিহার রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড অরুণ সিং, কমরেড সাধনা মিশ্র সহ বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবক-মহিলা ও শত শত সাধারণ মানুষ।

রাজীবের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘিরে কিছু প্রশ্ন

একের পাতার পর

যেন এক মুহূর্তে গোটা রাজ্যের ভেঙে পড়া আইন-শৃঙ্খলার প্রতীক হয়ে ওঠে।

স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন, সন্ধ্যার পর প্রতিদিনই এই চত্বর মদ্যপদের দখলে চলে যায়। জেলা শাসক-পুলিশ সুপারের নাকের ডগায় হওয়া সত্ত্বেও এ সব অবাধে চলেছে, পুলিশ-প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। কেন নেয়নি? জানত না বলে? এ কথা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? রাজ্যে এমন কোনও মদের ঠেক আছে কি, যার হদিশ পুলিশ জানে না, এমন কোনও দুষ্কর্ম আছে কি, যা নিয়মিত ঘটে অথচ পুলিশ তার খবর রাখে না? তা হলে পুলিশ ব্যবস্থা নেয় না কেন? শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন অপরাধ করার সাহস দুষ্কৃতীরা পায় কোথা থেকে? পুলিশ এই সমস্ত ঠেক থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায় ঠিকই, কিন্তু সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া দুষ্কৃতীরা এমনভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যে তা অবশ্যই শাসক রাজনৈতিক শক্তি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

কেন শাসক সিপিএম সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে এমন করে তাদের মদত জোগায়? শাসক সিপিএম যত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তত নির্বাচনে জেতার জন্য সমাজবিরোধীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। রাজ্যের মানুষকে নীতি-আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট করার ক্ষমতা আজ তারা সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে। নীতি-আদর্শের স্থান নিয়েছে পেশিশক্তি আর পুলিশ-প্রশাসনের শক্তি। এই পেশিশক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি সিঙ্গুরে আন্দোলন ভাঙতে তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও হত্যার সময়ে, পেয়েছি নন্দীগ্রামে গরিব কৃষক-সাধারণ মানুষের আন্দোলন দমন করতে গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালানোর সময়ে, নেতাইয়ের গণহত্যাকাণ্ডে। এই পেশিশক্তির পরিচয় রাজ্যের মানুষ দেখে আসছে ছোট-বড় প্রতিটি নির্বাচনে। সিপিএম শাসনে এ রাজ্যে ১৫৮ জন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মী খুনের ঘটনায় শাসক সিপিএমের দুর্বৃত্তের রাজনীতিরই পরিচয় পেয়েছে। এই ক্রিমিনালরা যাতে অবাধে দুষ্কর্ম চালিয়ে যেতে পারে সে জন্য প্রশাসনের ন্যূনতম নিরপেক্ষতাকেও বিসর্জন দিয়ে তাকে পুরোপুরি দলের কুক্ষিগত করা হয়েছে। পাশাপাশি গোটা সমাজ জুড়ে পরিকল্পিতভাবে নীতি-নৈতিকতার অবনমন ঘটাতে সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে চলেছে, সর্বত্র বেআইনি মদের ঠেক গড়ে তুলতে দেওয়া হয়েছে, অলিতে-গলিতে অবাধে চলছে অনলাইন লটারি, ভিডিও পার্লার, আর নোংরা ছবির রমরমা। স্কুলস্তরে চালু হয়েছে যৌনশিক্ষা। এ সবেরই প্রভাব পড়েছে ছাত্র-যুব সমাজের উপর। বাড়ছে ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি-ধর্ষণের ঘটনা, চুরি-ছিনতাই-রাহাজানি। রাজীব খুনের ঘটনা রাজ্যে সিপিএমের রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ফল। সন্তানদের হার্মাদ বানানোর এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন নেতাই গ্রামের মানুষরা। এই অপশাসন যত দীর্ঘায়িত হবে, ততই আরও অসংখ্য রাজীবকে খুন হতে হবে, আরও অসংখ্য রিঙ্কুর জীবন-মান বিপন্ন হবে।

ঘটনার পরের দিন বিষয়টি নিয়ে জনমানসে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হলে এবং সমস্ত মহল থেকে প্রবল ধিক্কার উঠলে তারও পরের দিন নিহত রাজীব দাসের বাড়িতে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। রাজ্য জুড়ে বিগত কয়েক বছরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু ঘটনাই ঘটেছে। কখনও মুখ্যমন্ত্রীকে এমন তড়িঘড়ি উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। যদিও আগেকার প্রায় সমস্ত ঘটনায় সরকারি পুলিশ অথবা দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনীই ছিল হোতা। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, লালগড়, সর্বশেষ নেতাইয়ের গণহত্যা — কোথাও বিপন্ন মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতিসূচক একটি কথাও শোনেনি। তা হলে মুখ্যমন্ত্রী বারাসাতে এভাবে ছুটে গেলেন কেন? সামনে নির্বাচন বলে নয় কি? যদিও স্থানীয় মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার জানিয়েছেন, গো-ব্যাক ধ্বনি দিয়েছেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিক্ষোভে এবং বারাসাত মহকুমা বনধে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সেখানে ছুটে যাওয়ার আগে যদি সেদিন রিঙ্কুদের সাহায্য করতে অস্বীকার করা পুলিশদের এবং সামগ্রিকভাবে এলাকার দায়িত্বে থাকা ডি এম এবং এস পি-কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য বরখাস্ত করতেন, যদি রাজ্যে সমস্ত মদের ঠেক, অনলাইন লটারি, জুয়া-সাট্টার ঠেক ভাঙার নির্দেশ দিতেন, মদের ঢালাও লাইসেন্সের নীতিকে বাতিল ঘোষণা করতেন, তা হলে বোঝা যেত তিনি সত্যিই এই ধরনের ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং সত্যিই তিনি চান এই ধরনের অপরাধের গোড়া ধরে টান দিতে। নির্বাচিত একটি সরকার এবং নিরপেক্ষ একটি প্রশাসনের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ এটুকু তো অন্তত আশা করে। পরিবর্তে তিনি রাজীবের বাড়িতে গিয়ে একান্তে কথা বলে দু'লক্ষ টাকা সাহায্য ঘোষণা করে এসেছেন। এই টাকায় হয়ত তাদের পরিবারের কিছুটা আর্থিক সহায়তা হবে। কিন্তু এমন ঘটনা তো প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটে চলেছে, যা সব সময় সংবাদমাধ্যমে আসে না, বা এমন করে তা নিয়ে হইচই হয় না। ঘটনাটি একদিকে যেমন রাজীব দাসের পরিবারের ব্যক্তিগত, একই সাথে পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও রয়েছে। যে সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণতি এই মৃত্যু, যা তাঁদের দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকের অপশাসনের ফল, সেই ক্ষতি মুখ্যমন্ত্রী কী দিয়ে পূরণ করবেন? আসলে যে ক্ষতির জন্য দায়ী তাঁদের নিজেদের অপদার্থতা, নীতিহীনতা, জনস্বার্থবিরোধী রাজনীতি, সর্বোপরি মালিকতোষণ নীতি, সেখানে তো সত্যিই তাঁদের কিছু করার নেই। তা হলে তো তাঁদের রাজনীতিটাকেই বদলাতে হয়! তা বোধহয় তাঁদের পক্ষে আজ আর সম্ভব নয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত বিষয় নিয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। কিন্তু রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যাঁরা এই ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, যারা আরও কঠিন পরিণতির কথা ভেবে যথার্থই আতঙ্কিত বোধ করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই নীরবতা তাঁরা মেনে নেবেন কী করে?

আশার কথা, রাজ্যের আপামর সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে সর্বত্র সরকারি অপদার্থতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। কিন্তু শুধু এর দ্বারাই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব হবে না, প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন সংগঠিত প্রতিবাদ-আন্দোলন। অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শুধু প্রশাসনের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট থাকা নয়, পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষকেই সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ, মদের ঠেক ভাঙা, সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে একদিকে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, অপরদিকে জনসাধারণকেই এগিয়ে এসে এ সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলন একদিকে যেমন প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে, তেমনি জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে নিষ্ক্রিয় মনোভাব, তা দূর করবে।

জনগণ যদি সচেতন হত, সক্রিয় ভূমিকা পালন করত, সংগঠিতভাবে রুখে দাঁড়াত অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, তাহলে সরকারি উদাসীনতা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনা ঘটত কম। আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের চেতনা বাড়তে থাকে, তারা ভালো-মন্দ বুঝতে শেখে, শত্রু-মিত্র চিনতে পারে, নৈতিক মানের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে দেখা গেছে, আন্দোলন থেকে সংখ্যালঘু ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষকে আলাদা করার জন্য শাসক সিপিএমের নেতারা দিল্লির ইমামকে এনে হাজির করেছিলেন। কিন্তু নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনি যখন মসজিদ থেকে ধর্মের বাণী শোনাবেন, তখন আমরা তা শুনব। আন্দোলনের ময়দানে আপনার কোনও কথা শুনব না। এই চেতনা তো বই পড়ে আসেনি, এসেছে গণআন্দোলনের মধ্য থেকেই।

আবার, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আন্দোলন করেও অসামাজিক সমস্ত কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না। কারণ এই ব্যবস্থা তার পচা-গলা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম দিচ্ছে। ভোগবাদী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার যুব সমাজকে অপসংস্কৃতির জালে জড়িয়ে ফেলছে, অনৈতিক জীবনের দিকে আকৃষ্ট করছে। অথচ ডান-বাম নির্বিশেষে সমস্ত সরকারই আজ এই পুঁজিবাদেরই সেবা করে চলেছে, তাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিনই এ সব ঘটতে থাকবে। তাই অসামাজিক কার্যকলাপ বিরোধী আন্দোলনকে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনই পারে এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপকে চিরতরে বন্ধ করতে।

ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে বারাসতে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট

একের পাতার পর

এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এম এস এস কর্মীরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। ১০৪ জন বিক্ষোভকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এস ইউ সি আই (সি) ১৭ ফেব্রুয়ারি ১২ ঘণ্টার বারাসত মহকুমা বনধের ডাক দেয়। এ আই ডি এস ও বারাসত মহকুমায় ছাত্র ধর্মঘটের এবং রাজ্য জুড়ে শোকদিবস পালনের আহ্বান জানায়। দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়ঃ (১) অবিলম্বে সমস্ত খুনিদের গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, (২) রাজীব দাসের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (৩) দোষী পুলিশ কর্মী এবং তাদের উর্ধ্বতন পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের শাস্তি দিতে হবে, (৪) মহিলা সহ সকল মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং মদ-জুয়া-সাট্টার ঠেক-ব্লু ফিল্ম চক্র ভাঙতে হবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি বনধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বারাসত, হাবড়া, মছলন্দপুর সহ বিভিন্ন স্থানের দোকানপাট, হাটবাজার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়নি। অফিস ও ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রার্থনা হওয়ার পর ছুটি দেওয়া হয়। বারাসত পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সহ গোটা রাজ্য জুড়ে শোকবেদি স্থাপন করে রাজীব দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়। বারাসত মহকুমা বনধ ছিল এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত যে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাঁরা এতদিন শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরাও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন। বারাসত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, 'আজ স্কুলের রেজিস্টার খাতায় আমি সই করব না। এটাই আমার প্রতিবাদ। তোমরা ডি এস ও ধর্মঘট ডেকে ঠিক করেছ।' হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে এলেও ডিএসও কর্মীদের আবেদনে পরীক্ষা না দিয়ে ফিরে যান। ডিএসও কর্মীরা অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীদের কালো ব্যাজ পরাতে চাইলে সকলেই সাগ্রহে কালো ব্যাজ পরেন। হাটথুবা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রার্থনার পর শিক্ষকরা নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শোকদিবস পালন করেন। বারাসত সত্যভারতী বিদ্যাপীঠেও একইভাবে স্কুলের উদ্যোগেই শোকদিবস পালিত হয়। বারো ঘণ্টার বারাসত মহকুমা বনধ এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে, বনধের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও দোকানপাট বিশেষ খোলেনি এবং যানবাহনকে বনধের আওতার বাইরে রাখা সত্ত্বেও বহু বেসরকারি বাস রাস্তায় নামেনি। এই বনধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করার জন্য দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস জনগণকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়। সংগঠনের জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে এ দিন জয়নগর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পাঁচ শতাধিক কর্মী-সমর্থকের একটি সুসজ্জিত মিছিল জয়নগর স্টেশন থেকে রথতলা হয়ে থানার সামনে পৌঁছায়। সেখানে পথ অবরোধ করা হয় এবং বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস দিব্যেন্দু মুখার্জী, রেণুপদ হালদার, বাসুদেব ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ সরদার ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অজয় সাহা। কমরেড সেলিম শা'র নেতৃত্বে ওসি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর ও সোনারপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি কমরেড প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী ও কমরেড দিবাকর হালদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বারুইপুর এসডিপিও অফিসে স্মারকলিপি দেয়।

নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কোতোয়ালি থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে রাজীব দাসের হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, মহিলা সহ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং ক্রমবর্ধমান খুন, ধর্ষণ, নারীপাচার, ইভটিজিং, মদ-জুয়া-সাট্টার ঠেক বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস প্রবীর দে, মহিউদ্দিন মণ্ডল, বরুণা দাশগুপ্ত ও মহিন্দর রহমান। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এদিন প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি বারাসতে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ

আন্দোলন কীভাবে নৈতিকতা দেয় মিশর তা আবার দেখাল

মিশরের স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন আজ দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামে গভীর প্রেরণার উৎস। এই আন্দোলনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিমধ্যেই ইয়েমেন, বাহরিন, লিবিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশের মানুষ স্বৈরাচারের শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলনের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছে। গণআন্দোলন কীভাবে নৈতিকতা দেয়, চারিত্রিক মানকে উন্নত করে মিশরের এই আন্দোলন বিশ্ববাসীকে তাও দেখিয়ে গেল। ১৮ দিন ধরে লাগাতার এই আন্দোলন চলেছে, হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন, পুলিশ গুলি চালিয়ে তিন শতাধিক আন্দোলনকারীকে হত্যা করেছে। অতর্কিতে মুবারকের ক্রিমিনালবাহিনী হানা দিয়েছে, তা সত্ত্বেও আন্দোলন এতটুকু বিশৃঙ্খল হয়নি। এই শৃঙ্খলা গোটা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সাথে সাথে দেশবিদেশের সাংবাদিকদেরও বিস্মিত করেছে।

২ ফেব্রুয়ারি ছিল লক্ষ লোকের সমাবেশ। মার্কিন চিত্র সাংবাদিক ডানা স্মিলি বলছেন, ‘‘মিশরের কায়রো শহরে ১৫ বছর ধরে আমি কাজ করছি। কিন্তু আন্দোলনের এই ক’দিন যে নিরাপত্তায় রয়েছি, আগে তা কখনও ছিল না।’’ তিনি বলছেন, ‘‘কায়রো শহরে কয়েক সপ্তাহ আগেও যেকোনও নারী, বোরখা পরা বা বোরখাবিহীন, মিশরীয় বা বিদেশি সকলেই যৌন নির্যাতনের আতঙ্কে থাকতেন।’’ আন্দোলনের উত্তাল আবহাওয়া সব পাল্টে দিয়েছে। আরবীয় দৈনিক পত্রিকা ‘আল-আহরাম’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হানি শুকরাল্লাহ বলছেন, ‘‘নিরাপত্তা নিয়ে কায়রোর রাস্তায় জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছি; প্রত্যেকে ডানা স্মিলির কথাই প্রতিধ্বনিত করেছেন।’’ তারপর তিনি লিখছেন, ‘‘মিশরের রাজপথে তৈরি হচ্ছে নয়া মিশর। তার বহু নজিরের মধ্যে এটি একটি।’’

সি এন এন-এর সাংবাদিকও অভিভূত। তিনি লিখেছেন, লক্ষ লোকের বিশাল জমায়েত শুধু শান্তিপূর্ণই ছিল না, সমবেত প্রতিটি মানুষের চোখে মুখে ছিল আনন্দের ছাপ, সকলেই ছিল স্বআরোপিত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। কারণ তাঁরা সেখানে এসেছেন একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। যেমন তেমন করে গতানুগতিক পথে দাবি তোলা নয়, নতুন নতুন সৃজনশীলতায় দাবি উত্থাপন ভিন দেশের সাংবাদিকদেরও নজর কেড়েছে। এই আন্দোলনের সমর্থনে নেমে গিয়েছিল কলকারখানা, অফিস আদালতের শ্রমিক কর্মচারীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, ডাক্তাররা-ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা দেশের প্রতিটি শহরে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তুলেছিলেন ‘পপুলার কমিটি’, যাতে দুষ্কৃতীরা বা মুবারকের দলের সমাজবিরোধীরা চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-লুঠপাট চালিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে না পারে। দিবারাত্র অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করেছে এই কমিটি।

নন্দীগ্রামের আন্দোলনেও আমরা এ জিনিস লক্ষ করেছি। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে আন্দোলন চলাকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় কোনও চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-খুন-ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। দেখা গিয়েছে পারস্পরিক সহানুভূতি, সমবেদনা, পরার্থপরতা ও সংঘবদ্ধতার উজ্জ্বল নির্দশন।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও মার্কিন চিত্র সাংবাদিক লারা লোগ্যানের শ্লীলতাহানির ঘটনা বেদনাদায়ক। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যা ঘটিয়েছে মুবারকপন্থী দুষ্কৃতীরা, এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে।

আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল যুবকরাই। ২০০৮ সালে শিল্প শ্রমিকদের ৬ এপ্রিলের ধর্মঘটের সমর্থনে গড়ে ওঠা ‘এপ্রিল সিক্স ইয়ুথ মুভমেন্ট, মুসলিম ব্রাদারহুডের যুব সংগঠন, আল বেরেইদির ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর চেঞ্জ, উদারপন্থী ওয়াফড পার্টি, আল ঘাধ পার্টি প্রভৃতি সংগঠনের যুবকরা এই আন্দোলনের অন্যতম শক্তি। কিন্তু লক্ষণীয় দিক হল, আন্দোলনের এই পরিবেশে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছিল নিয়ন্ত্রণে। এই আন্দোলন যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের জন্ম দিয়েছিল তার আঁচে তাপে ব্রাদারহুডের মৌলবাদী ধ্যানধারণা ডানা মেলতে পারেনি। আন্দোলনের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ সেক্যুলার। হানি শুকরাল্লাহ লিখছেন, ‘‘আন্দোলনের উত্তাপ মুসলিম ব্রাদারহুডকেও কিছুটা পাল্টে দিয়েছে। ৭০ দশকের মুসলিম ব্রাদারহুড, আর আজকের লড়াইয়ের ময়দানের ব্রাদারহুড এক নয়।’’ এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় আন্দোলনের তরঙ্গের অভিঘাতে মৌলবাদী চিন্তা কীভাবে দূর হয়ে যায়।

ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনই যে মৌলবাদী দুষ্ট শক্তির সামনে কার্যকরী প্রতিষেধক তা এ রাজ্যের মানুষ দেখেছে নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রেও। নন্দীগ্রামের সেজ বিরোধী আন্দোলন ধ্বংস করতে সিপিএম দিল্লির ইমামকে নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল তাঁর কথাতেই হয়তো মুসলিম ধর্মাবলম্বী কৃষকরা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবে। কিন্তু আন্দোলনকারী মুসলিম ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষরাই ইমামকে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। সাম্রাজ্যবাদী সালিমের স্বার্থে জমি দখলের জন্য ইমামকে দিয়ে চাষি আন্দোলন ভাঙার যে ষড়যন্ত্র সিপিএম করেছিল এই আন্দোলন তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ চেতনা যে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয় নন্দীগ্রামের মতো মিশরও তা আবার স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিল। (সূত্র ঃ আউটলুক ১৪-২-১১)

সিপিএমের বিদায় আসন্ন

SUCI
SUCI
SUCI
SUCI
SUCI
CENTRE
IST)
COMM

মিছিল নিয়ে জনসভায় ঢুকছেন কমরেড সৌমেন বসু

একের পাতার পর

একদিকে মানুষ অনাহারে মরছে, চাষি জমি রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে মা-বোনেরা, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, আর উন্নয়ন হচ্ছে সিপিএম নেতাদের আত্মীয়দের। কী বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক আজ তাঁরা। এই তো উন্নয়ন! এ হল হৃদয়হীন ক্রিমিনাল রাজনীতি। আমাদের শিক্ষক মার্কর্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, রাজনীতি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। আজ কোথায় সেই হৃদয়বৃত্তি? মরিচঝাঁপি থেকে শুরু করে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম লালগড় নেতাই— কীভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এর নাম কি রাজনীতি? এর নাম কি বামপন্থা? মুখ্যমন্ত্রী কুলতলিতে গিয়ে বলেছেন, তৃণমূলের সঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জোট করার ফলে নাকি আমাদের লাল পতাকার রঙ বদলে গেছে। বন্ধুগণ, তৃণমুলের সঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জোট করেছে কোনও সুযোগ-সুবিধার জন্যে নয়। টাটা-বিড়লার পায়ে ধরার জন্যে নয়। সালিমকে ডেকে আনার জন্য নয়। গরিব চাষি নিধনের জন্য নয়। সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে হত্যার পরে, নন্দীগ্রামে চাষি-মজুরদের গণহত্যা এবং গণধর্ষণের পরে, আমরা সিদ্ধান্ত নিই, তৃণমূল-এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আন্দোলনের জোট গড়ে প্রতিরোধ না করলে টাটা-সালিমদের স্বার্থবাহী সিপিএমের এই ফ্যাসিস্টিক সন্ত্রাসকে পরাস্ত করা যাবে না। এখন এই দুর্নীতি-দাপট-সন্ত্রাস-গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার স্বৈরাচারী অপশাসনের অবসান আমাদের আশু লক্ষ্য। সকলেই জানেন, মার্কসবাদের কথা আওড়ালেই কেউ কমিউনিস্ট হয় না। যেমন গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না, আলখাল্লা পরলেই ফকির হয় না। শ্রমিক-কৃষককে হত্যা করে, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির পদলেহন করে, মিথ্যাচারে-ভ্রষ্টাচারে এ রাজ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করে সিপিএম মহান বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে। তাদের হাতের লাল পতাকা গরিব শোষিত মানুষকে প্রতারণার জন্য। শোষকদের আরও লুঠের স্বার্থ পাহারা দিয়ে, আরও ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য। ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে এখনও তাদের ক্ষমতার লোভ, ক্ষমতার চেয়ার আঁকড়ে থাকার লোভ যায়নি। কিন্তু নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনজাগরণ ঘটেছে। এবার তাদের বিদায় আসন্ন। এই ভয়ে তারা আতঙ্কিত।

বন্ধুগণ, আমি মনে করি পশ্চিমবাংলার জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত সিপিএমকে বিপুলভাবে পরাজিত করবে। কিন্তু এই সিপিএম বিরোধী উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের হাত ধরাধরিটাকে আপনারা ভুলে যাবেন না। এই কিছুদিন আগেই সিপিএমকে বাঁচাতে এক কথায় ও মাত্র একদিনের মধ্যেই দু’হাজার কোটি টাকা প্রণববাবুরা কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দেউলিয়া সিপিএম সরকারকে দিয়েছেন। ভুলে যাবেন না, ওই লালগড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে সাধারণ মানুষের উপর যৌথ বাহিনীর অত্যাচার, সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনীকে পাহারা দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য করে সিপিএমের মুক্তাঞ্চল বানানোর সুযোগ করে দিয়েছে কংগ্রেস। আজ বুদ্ধদেববাবুরা মনে করছেন, কয়েকটা সিট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাওয়া যায়।

এই সিপিএম কোনও দিনই মার্কসবাদী ছিল না, এখন বামপন্থা থেকেও বিচ্যুত। একে ক্ষমতা থেকে সরানোটা এখন শোষিত মানুষের কর্তব্য। তারপর পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সার্বিক মুক্ত নতুন সমাজের জন্য গরিব মানুষকে লড়তে হবে মার্কসবাদের বিজ্ঞানভিত্তিক মহান দর্শনকে ভিত্তি করে। এই কথা বলে এবং আন্দোলনে ও আসন্ন নির্বাচনে সিপিএমকে পরাস্ত করার কাজে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একজোট থাকবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে, এই বার্তা রেখে আপনাদের সকলকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি।

সি আই ডি রিপোর্টে সশস্ত্র ক্রিমিনাল ক্যাম্প প্রমাণিত

একের পাতার পর

যৌথবাহিনী ঢোকার পর এত মানুষ খুন হয়েছে যা লালগড় আগে দেখেনি। যৌথবাহিনীর টহলদারির মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্রিমিনালদের দলগুলি সিপিএমের বিভিন্ন নেতার বাড়িতে ক্যাম্প করে রয়েছে। অথচ যৌথবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। কেন নেয়নি? ৭ জানুয়ারি নেতাইয়ে ক্রিমিনালদের গুলিতে এত মানুষের মৃত্যুর পরও তারা কোনও তৎপরতা দেখাল না কেন? যৌথবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে এত ক্রিমিনাল সরে যেতে পারল কী করে? সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এই সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনায় আনা অত্যন্ত জরুরি। আর তা করতে গেলেই বেরিয়ে আসবে নেতাই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাজ্য সরকার, পুলিশ এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথবাহিনীর ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও সিপিএম আঁতাত আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এই অবস্থায় সিবিআইয়ের হাতে দায়িত্ব গেলেও, সত্য কতখানি উদ্‌ঘাটিত হবে, তা নিয়ে সংশয় তো থাকেই।

তবুও সিআইডি-র তদন্ত যতটুকু এগিয়েছে, তাতে সিপিএমের মিথ্যাচারের মুখোশ নগ্ন হয়ে পড়েছে। সিপিএম জোর গলায় বলত, জঙ্গলমহলে কোনও হার্মাদ ক্যাম্প নেই। বিমান বসু, প্রকাশ কারাত থেকে শুরু করে সিপিএমের সর্বভারতীয় মুখপত্র পিপলস ডেমোক্র্যাসি ও বাংলা মুখপত্র গণশক্তি তারস্বরে এই কথা প্রচার করে গেছে। দিল্লিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদের ভট্টাচার্যও একই কথা বলে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে। অথচ ধৃত সিপিএম নেতার জবানবন্দী থেকেই প্রমাণিত, জঙ্গলমহলে তাদের সশস্ত্র হার্মাদ শিবির রমরমিয়ে চলছে। এও প্রমাণিত যে, সেগুলির দায়িত্বে রয়েছেন তাঁদের এক একজন স্থানীয় নেতা।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই কাণ্ড থেকে শুরু করে রাজ্যের অসংখ্য ঘটনা নগ্ন করে দেখিয়েছে, সিপিএম কীভাবে ক্রিমিনাল নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং কীভাবে সমগ্র প্রশাসনকে দলের কুক্ষিগত করে ফেলেছে। কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে না উঠলেও এই পার্টিটি ১৯৭০-এর দশকের আগে পর্যন্ত বামপন্থী মানসিকতার ভিত্তিতে এ রাজ্যে গণ-আন্দোলনের মধ্যে থাকত। কংগ্রেসী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রাজ্যের সাধারণ মানুষ পরম বিশ্বাসে এই পার্টিটিকে আঁকড়ে ধরেছিল। সেই পাটিটির এমন ক্রিমিনাল নির্ভরতা রাজ্যের সংগ্রামী বামপন্থী মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে খুবই বেদনার, আবার একই সাথে চোখ খুলে দেওয়ার মত। এই দলটি বামপন্থা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আজ চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করছে, কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে মাল্টিন্যাশনালদের হাতে তুলে দিচ্ছে, প্রতিবাদ করলে খুন করছে, মা-বোনেদের সম্ভ্রম লুঠ করছে, প্রতিবাদী শ্রমিকদের খুন করছে। এরই অনিবার্য পরিণামে পার্টিটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং ভোটে জেতার জন্য ক্রিমিনাল নির্ভরতা বাড়ছে। এদের এই সমস্ত কুকর্মকে, চূড়ান্ত অকমিউনিস্ট ও অবাম কার্যকলাপকে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ হিসাবে দেখিয়ে ধূর্ত মালিকশ্রেণী ও তাদের প্রচারমাধ্যম মহান কমিউনিস্ট আদর্শের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। বাস্তবে, সিপিএম পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে কমিউনিজম বিরোধিতার তাস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে, সত্যিকারের বামপন্থার স্বার্থেই এই দুষ্ট শক্তির অপসারণ জরুরি। এই মুহূর্তের দাবি, জঙ্গলমহল থেকে সমস্ত ক্রিমিনাল ক্যাম্প তুলে দিতে হবে, অত্যাচারী যৌথবাহিনীকে অপসারণ করতে হবে, নেতাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সমস্ত ক্রিমিন্যালদের শাস্তি দিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

যাদবপুরে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে থানায় বিক্ষোভ

১৩ ফেব্রুয়ারি যাদবপুর থানার অন্তর্গত লায়েলকা মাঠে রূপালী সোম ও বর্ণালী সোম নামে দুই বোন স্থানীয় 'উদ্যোগ' ক্লাবের দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত ও শ্লীলতাহানির শিকার হন। ক্লাবের মধ্যেই একটি মদের ঠেক চলে। মদ্যপ অবস্থায় ঐ দুষ্কৃতীরা এঁদের বাড়িতে চড়াও হয়ে রূপালীর বাবা-মা ও ভাইদের প্রচণ্ড মারধর করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (এ আই এম এস এস)-এর পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল আক্রান্ত পরিবারটি ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। তাঁরা জানান, যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও প্রকৃত অপরাধীদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি, উপরন্তু দুষ্কৃতীরা এলাকার সাধারণ মানুষ সহ ঐ পরিবারটিকে হুমকি ও শাসানি দিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবারটি সহ গোটা এলাকার মানুষই সন্ত্রস্ত।

ঐ দিন বেলা দুটো নাগাদ এ আই এম এস এস সদস্যরা যাদবপুর থানায় বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে ওসি-র অনুপস্থিতিতে সেকেন্ড অফিসারকে তাঁরা স্মারকলিপি দেন। অফিসার জানান, ঐ মদের ঠেকটি তাঁরা ভেঙে দেবেন এবং 'উদ্যোগ' ক্লাবটি সিল করে দেবেন।

ALL INDIA
MSS
AIMSS

থানার সামনে একটি বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপ্না দাশগুপ্ত এবং জেলা কমিটি সদস্য কমরেড কল্পনা দত্ত।

বাসন্তীতে সিপিএমের আক্রমণে ৪৩টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

ত্রাণ বণ্টন করলেন সাংসদ তরুণ মণ্ডল

দঃ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার নির্দেশখালি গ্রামে ১১ ফেব্রুয়ারি সিপিএম দুষ্কৃতীদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুঠতরাজে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় ৪৩টি পরিবার। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল পরদিনই সেখানে ছুটে যান এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু ২০ কেজি চাল, পাঁচ কেজি আলু ও তেল-ডাল-নুন প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতা কমরেডস নির্মল সরকার, বৈদ্যনাথ বর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, ''ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির বেঁচে থাকার ন্যূনতম সামগ্রীটুকুও নেই, সরকারও তাঁদের জন্য বিশেষ কিছু করেনি। তাই, সামান্য খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে তাঁদের প্রতি আমার সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।''

নির্দেশখালি গ্রামের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন এখনও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এর তীব্র সমালোচনা করে ডাঃ তরুণ মণ্ডল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ও নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।

धरना
15 सूत्री मांगों
DYO

সকল বেকারের কাজ, ন্যূনতম বেতন, শ্রম আইন কার্যকর ইত্যাদি দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এ আই ইউ টি ইউ সি এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে ধরনা

প্রকাশিত হয়েছে

মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণে

প্রভাস ঘোষ, মানিক মুখার্জী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, রণজিৎ ধর, অসিত ভট্টাচার্য

প্রাপ্তিস্থান ঃ এস ইউ সি আই (সি) অফিস, ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মচারীদের নজিরবিহীন প্রতিবাদ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ২৫ জানুয়ারি প্রতিবাদের ইতিহাস রচনা করলেন। বেতন, মহার্ঘভাতা, সিএএস, পদোন্নতি, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, স্বচ্ছ নিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সিপিএম সরকারের ৩৫ বছরের সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১১ দফা দাবিতে রাজ্যপাল, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, উপাচার্য ও নিবন্ধককে বারবার ডেপুটেশন দিয়েও কোনও ফল না হওয়ায় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের আহ্বানে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ কর্মচারীরা 'গণছুটি' নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম অচল করে দিলেন। ঐ দিন কলেজ স্ট্রিট, রাজাবাজার ও বালিগঞ্জ ক্যাম্পাসে প্রায় ৭০ শতাংশ কর্মচারী কাজে যোগ দেননি। আলিপুর ক্যাম্পাস, বিহারীলাল কলেজ, গোয়েঙ্কা কলেজ সহ অন্যান্য ক্যাম্পাসগুলিতেও এর প্রভাব পড়ে। শাসক দলের হুমকিকে পরোয়া না করে সাধারণ কর্মচারীদের এইভাবে ঘুরে দাঁড়ানো শাসকদলের প্রতি চরম অনাস্থা জ্ঞাপনের পরিচায়ক।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে যাঁরা ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক প্রতীপ মুখার্জী কমিটির রিপোর্ট, ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক রমেন পোদ্দার কমিটির রিপোর্ট এবং ২০০৮ সালে অধ্যাপক অমলজ্যোতি সেনগুপ্ত কমিটির মূল রিপোর্ট সর্বসমক্ষে প্রকাশ না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রায় ২০ হাজার কর্মীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে বেতন কমিটির গোপন রিপোর্ট প্রকাশ সহ ১১ দফা দাবিতে এই আন্দোলনে কর্মচারীদের গণছুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

প্যারামেডিকেল স্টাফদের গণডেপুটেশন

বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম ও ক্লিনিকে কর্মরত প্যারামেডিকেল স্টাফরা চূড়ান্ত শোষণের শিকার। এঁদের নেই কোনও বেতন কাঠামো, নেই কাজের নির্দিষ্ট সময়, সামাজিক সুরক্ষা, কাজের নিরাপত্তা, সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক ছুটি। অথচ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা মূলত দাঁড়িয়ে আছে এইসব প্যারামেডিকেল কর্মীদের উপর। বহু প্যারামেডিকেল স্টাফ রোগ নির্ণয়ের কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন মারণ ব্যাধিতে। এঁদের পরিশ্রমের বিনিময়ে নার্সিংহোমের মালিক মুনাফার পাহাড় গড়ে, অথচ এঁদের চিকিৎসার ন্যূনতম দায়িত্ব নেয় না; এমনকী হেলথ হ্যাজার্ড ভাতাটুকুও দেয় না।

প্যারামেডিকেল স্টাফরা এর প্রতিকার চাইতে আন্দোলনে নেমেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি শ্রমমন্ত্রীর কাছে তাঁরা ডেপুটেশন দেন। তাঁদের দাবি, উপযুক্ত বেতন কাঠামো, সাপ্তাহিক ও নির্দিষ্ট বার্ষিক ছুটি, দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রম, সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটির সুযোগ-সুবিধা, হেলথ হ্যাজার্ড ভাতা সহ হেলথ হ্যাজার্ডে আক্রান্তদের চিকিৎসার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে চুক্তি প্রথা অবিলম্বে বন্ধ করা, চাকরির স্থায়ীকরণ, পিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালগুলিতে শূন্যপদে নিয়োগ, আউটসোর্সিং বন্ধ করা এবং অবিলম্বে প্যারামেডিকেল কাউন্সিল গঠন করা ইত্যাদি।

এই দাবিতে এ দিন প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শতাধিক সদস্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হয়ে মিছিল সহকারে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে অগ্রসর হন। পুলিশ বাধা দিলে তাঁরা তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ভিক্টোরিয়া হাউসের পাশে অবস্থান করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন সিস্টার ঋতুপর্ণা মহাপাত্র, রেখা গোস্বামী এবং সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষ। ৫ জনের প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে শ্রমমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারির কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। মন্ত্রী টেলিফোনে আশ্বাস দেন দাবিগুলি নিয়ে তিনি অবিলম্বে আলোচনায় বসবেন। দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে নেতৃবৃন্দ জানান।

গুয়াহাটিতে ছাত্র বিক্ষোভ

যথোপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি নোতোলাকৈ আৰু
৫ শ্ৰেণীক নিম্নপ্ৰাথমিক আৰু ৮ম শ্ৰেণীক উচ্চ প্ৰাথমিক
ছাত্র বিক্ষোভ
All India DSO Assam

উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে না তুলে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ না করে, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীকে যথাক্রমে নিম্ন প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৭ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি কামরূপ মহানগর জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড ভবতোষ চক্রবর্তী ও সম্পাদক কমরেড জিতেন্দ্র চালিহা।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।